লোকসংস্কৃতির ত্রিবলয়

সুজয় কুমার মণ্ডল, এম. এ

'সেতুবন্ধন' প্রকাশনা
সেন্টার ফর কম্যুনিকেসান এ্যাণ্ড কালচারাল অ্যাক্‌শন্
৫/১১, রাইফেল রেঞ্জ রোড
কলকাতা - ৭০০ ০১৯

- প্রথম সংস্করণ ঃ মে, ১৯৯৯
- প্রচ্ছদ ঃ বিমল রায়
- আলোকচিত্র গ্রহণ ঃ সুজয় কুমার মণ্ডল
- অলংকরণ ও রেখাচিত্র ঃ সুজয় কুমার মণ্ডল

- প্রকাশক ঃ সঞ্জীব সরকার
  'সেতুবন্ধন' প্রকাশনা
  সেন্টার ফর কম্যুনিকেসান এ্যাণ্ড
  কালচারাল অ্যাক্‌শন্‌
  ৫/১১, রাইফেল রেঞ্জ রোড
  কলকাতা - ৭০০ ০১৯

- কম্পোজ ও মুদ্রণ ঃ জে. আর. প্রিন্টার্স
  ৩৬, এস. এন. রায় রোড, কলকাতা - ৩৮

- পরিবেশক ঃ পুস্তক বিপণি,
  ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা -৯

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্য
মা ও বাবার শ্রীচরণে

পরিচায়িকা

শ্রীমান্ সুজয় কুমার মণ্ডল কৃতী ছাত্র। আমাদের লোকসংস্কৃতি বিভাগে ১৯৯৫ খ্রীস্টাব্দে সে 'তুলনামূলক লোকসংস্কৃতি' বিশেষপত্র নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে, আর সেই সুবাদে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'সুহাসিনী স্মারক পদকে' ভূষিত হয়। কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর সে গবেষণা শুরু করে লোক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে।

শ্রীমান্ সুজয়ের গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক রূপে এবং শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করার সময়েও তাকে পরিশ্রমী ও বিষয় নিষ্ঠ রূপে দেখেছি। সে নিজে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসেছে। লোকসংস্কৃতির প্রতি তার আকর্ষণ অকৃত্রিম ও মজ্জাগত। একদিকে ব্যাপক ভাবে সে ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছে যা অনেকেরই ঈর্ষণীয় মনে হবে, অন্যদিকে সে লোকসংস্কৃতি সম্পৃক্ত অত্যাধুনিক তত্ত্বগুলিব পঠন-পাঠন ও প্রয়োগে যত্নশীল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছে। মোটামুটিভাবে সেগুলিকেই এবং তার সঙ্গে আরও দু'একটি নতুন লেখার সংযোজন ঘটিয়ে বর্তমান বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি রচিত। গ্রন্থটির সুস্পষ্টভাবে তিনটি বিভাগ। প্রথম বিভাগটি ব্যয়িত হয়েছে লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও তত্ত্বের আলোচনায়। দ্বিতীয় বিভাগটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ - মোট সাতটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, প্রতিটি লোকশিল্প কেন্দ্রিক। দশাবতার তাস, বেলমালা, মুখোশ শিল্প, মেচ বমণীদের বয়ন শিল্প, লেপচা জনজাতির লোকশিল্প, সেরপাই শিল্প নিয়ে এই তরুণ ও সম্ভাবনাময় গবেষক তথ্য ভিত্তিক আলোচনা করেছে। এই সব আলোচনা শ্রীমানের ক্ষেত্রানুসন্ধানলব্ধ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। গ্রন্থের তৃতীয় বিভাগটিতে চৈতন্যদেব বাংলার লোক ধর্মগুলিকে কতখানি অনুপ্রাণিত করেছেন সেই বিষয়ে যেমন আলোচনা স্থান পেয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 'লোকসংস্কৃতির ত্রিবলয়ে' কোরকের পরিপূর্ণ কুসুমে উত্তরণের সুস্পষ্ট ইঙ্গি তটি লভ্য। গ্রন্থটি লোকসংস্কৃতি প্রেমী মানুষের দ্বারা আদৃত হবে, এ বিশ্বাস পোষণ করি।

ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী

বিভাগীয় প্রধান

লোকসংস্কৃতি বিভাগ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কবিপক্ষ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ

কথামুখ

একটি বহুল প্রচলিত লোককথা দিয়েই শুরু করি — এক অন্ধকার রাত্রিতে এক বৃদ্ধা আনমনে রাস্তায় কিছু খুঁজছিল। তখন এক পথিক তাকে জিজ্ঞাসা করে — 'তুমি কি কিছু খুঁজছো?' সে উত্তর দেয় - 'হ্যাঁ আমি আমার চাবি হারিযে ফেলেছি, সেই সন্ধ্যে থেকে তাই-ই খুঁজছি।' পথিকের কৌতূহল হয় — 'তুমি কোথায় চাবি হারিয়েছো?' বৃদ্ধা জানায়, 'আমি সঠিকভাবে জানিনা, তবে মনে হয় ঘরের মধ্যেই হবে।' তখন পথিক বিস্ময়ে আবার জিজ্ঞাসা করে — 'তবে কেন ঘরের বাইরে খুঁজছো'? বৃদ্ধা তখন পথিকের কৌতূহল মেটায় — 'কারণ ঘরের মধ্যে অন্ধকার, আমার ল্যাম্পে আবার তেল নেই, রাস্তায় আলো রয়েছে — তাই এখানে আমি ভালো দেখতে পাচ্ছি।'

বর্তমানে আমরা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির শিকড়টিকে জানার জন্য, উপলব্ধি করার জন্য বা গবেষণার জন্য ঐ গল্পের নীতি অনুসরণ করি। আমরা সবকিছুকে আলোর মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করি অর্থাৎ অবিরাম নিরীক্ষণ চলে তথাকথিত উপরের স্তরের সংস্কৃতির বলয়ে। কিন্তু আমাদের বিচরণ লোকসমাজের অন্দর মহলের 'expressive culture' এর ঘরে ঘরে, যার মধ্যে রয়েছে অগণিত সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের ইতিকথা। এখানেই 'চাবি' খোঁজার অনুষঙ্গেই খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের সংস্কৃতির মূল শিকড়কে। বর্তমান গ্রন্থ সেই শিকড় অন্বেষণ মাত্র—

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগে (Department of Folklore) স্নাতকোত্তর পর্যায়ে লোকসংস্কৃতি (Folklore) পঠন-পাঠনের সময় থেকেই আমার মন লোকসংস্কৃতিকে পরিপূর্ণভাবে জানার আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে পড়ে, যদিও আমার মনে ছেলে বেলা থেকেই প্রচ্ছন্ন ভাবে বয়ে চলছিল - লোকসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ, কৌতূহল ও সহমর্মিতা, যা আরো ব্যাপকতা লাভ করে গবেষণার সময়ে। এক্ষেত্রে দুটি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতেই হয় —

প্রথমত: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ লোকসংস্কৃতি বিভাগ (১৯৯০) এবং দ্বিতীয়ত কলকাতার একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সেণ্টার ফর কম্যুনিকেশন এ্যাণ্ড কালচারাল অ্যাক্‌শন্ (সি.সি.সি.এ)। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গত দুবছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অনুসন্ধানমূলক ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি। আর তারই প্রথম ফসল বর্তমান গ্রন্থ — ' লোকসংস্কৃতির ত্রিবলয়'।

লোকসংস্কৃতির শুধুমাত্র তিনটি বলয়ের বাঁধনে গ্রন্থটি গ্রথিত। প্রথম বলয়ে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের তত্ত্ব ও পদ্ধতির কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিশেষ করে 'Metafolklore' । বলাবাহুল্য লোকসংস্কৃতির 'লোক' (Folk) কারা, এ নিয়ে বিদগ্ধ মহলে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। এই তর্ক-বিতর্ককে সামনে রেখে পূর্বের 'লোক' সম্পর্কিত মতামত ও অত্যাধুনিক মতামতকে সমন্বয় করে এ বিষয়ে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের আলোকে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বলয়ের আলোচ্য বিষয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন লোকশিল্পকলা (Folkart& Craft), যা আমাদের গ্রাম-দেশেব আর্থিক বুনিয়াদকে শক্ত করে। সমাজ জীবনে লোকশিল্পের ভূমিকা অপরিসীম, যে শিল্পকর্ম সমাজে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয় ঐতিহ্যগতভাবে। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজচেতনা ও চিন্তন-মননের পরিবর্তন ঘটে, পাশাপাশি পরিবর্তন ঘটে লোকসমাজের শিল্পকলার ধারাবাহিকতার ও আঙ্গিকের। এই সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বহুল আলোচিত এবং অনালোচিত লোকায়তশিল্পের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অবশ্যই শিল্পীকে বাদ দিয়ে নয়। লোকশিল্পীদের জীবনের কথা পর্যালোচনা করে সমাজে তাঁদের সাংস্কৃতিক - ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছি। সবচেয়ে বড়কথা হল - 'লোকশিল্প- শিল্পের জন্য শিল্প নয়, জীবনের জন্য শিল্প'।

তৃতীয় বলয়ে লোকসংস্কৃতির বিকাশে ও চর্চার ক্ষেত্রে দুজন মহান ব্যক্তির অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত: চৈতন্যদেব, তাঁকে কেন্দ্র করে লৌকিক ধর্ম থেকে শুরু করে লোকসংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানও গৌরবময় হয়েছে। তাই চৈতন্যদেবের এই বিশেষ দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছি। আর রবীন্দ্রনাথ - প্রীতিই আমাকে এক অধিক আলোচিত বিষয়কে আবার অনুসন্ধানে ব্যাকুল করেছিল। তারই কোলাজের মত রূপরেখা হল — 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি' নিবন্ধটি। প্রসঙ্গক্রমে বলাবাহুল্য বর্তমান গ্রন্থে বারোটি বিষয় প্রবন্ধাকারে প্রকাশ পেয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বেই প্রকাশিত।

গ্রন্থটি লেখার ব্যাপারে যাঁর কথা প্রথমেই বলতে হয় তিনি হলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের প্রধান শ্রদ্ধেয় ড.বরুণ কুমার চক্রবর্তী মহাশয়। তাঁর হাত ধরেই আমার লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের শিক্ষা। বলাবাহুল্য, বর্তমান গ্রন্থটির নামকরণ তিনিই করেছেন। একই সঙ্গে গ্রন্থটিকে গৌরবময় করেছে তাঁর সাবলীল ভাষায় লেখা পরিচায়িকা। তাঁর স্নিগ্ধ আশীর্বাদ আমাকে সার্থকতার পথে অগ্রসর করে দিয়েছে অনেকটাই লেখা । এছাড়া তাঁর সদাসর্বদা অমূল্য উপদেশ, আন্তরিক সহযোগিতা ও নিরন্তর প্রেরণার ফলেই আমার এই গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে। লোকসংস্কৃতির প্রতি এই আত্মনিবেদিত মানুষটির চরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। এর পরেই উল্লেখ করতে হয় কলকাতার 'সি.সি.সি.এ'র অধিকর্তা সঞ্জীব সরকার মহাশয়ের নাম। এই সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষটিরও

আন্তরিক সহযোগিতা আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহী করেছে। তাঁর কাছেও আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

এছাড়া যাঁদের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা, কর্মপ্রয়াস ও সহযোগিতায় গ্রন্থটির প্রকাশ সম্ভব হয়েছে তাঁরা হলেন শ্রদ্ধেয় ড.দিব্যজ্যোতি মজুমদার, ড.পল্লব সেনগুপ্ত, ড. দুলাল চৌধুরী, ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক, ড. শীলা বসাক, ড. শিপ্রা ঘোষ ও ড.ওয়াকিল আহমেদ। এঁদের সকলের কাছেও আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক বাসুদেব বর্মন মহাশয়কে। তিনি অন্য বিষয়ের বিদগ্ধ অধ্যাপক হয়েও লোকসংস্কৃতি বিভাগের নানা আলোচনা সভায় যে ধরনের প্রশ্ন ও চিন্তাভাবনার কথা তুলে ধরেছেন, তাও আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। বর্তমান গ্রন্থে তাঁর লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে দৃষ্টিকোণের ছায়াপাত ঘটেছে।

পরিশেষে, কৃতজ্ঞ রইলাম সি.সি.সি.এর রঞ্জনা ভট্টাচার্য, শ্রাবণী চক্রবর্তী, রচনা, সত্যব্রত ঘোষ, মানস মুখার্জী এবং বাকি কর্মিবৃন্দের কাছেও। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় বিভিন্ন জেলাতে যাঁরা বিভিন্নভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই। অধ্যাপক শ্রীকান্ত গৌড়, ড. রাখাল চন্দ্র নাথ, ড. দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীহর্ষ মল্লিক, বন্ধুবর সোমনাথ দাস, মলয় মণ্ডল, দাদা জিয়া-উল আলম এবং ভাই রামপ্রসাদ নস্কর - এঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ও উৎসাহ মনে রাখবার মত। প্রকাশনার ক্ষেত্রে সঞ্জীব সরকার এবং জে. আর প্রিণ্টার্সের পক্ষ থেকে জয়ন্ত ঘোষ ও বিমল রায় মুদ্রণের দায়িত্ব নিয়ে দুশ্চিন্তা মুক্ত করেছেন। সবচেয়ে বড় তাগিদ অনুভব করেছি আমার বাবা ও মায়ের কাছে। আমার এই নগণ্য প্রয়াস লোকসংস্কৃতির গবেষক, ছাত্র-ছাত্রী, সর্বোপরি লোকসংস্কৃতি অনুরাগীদের কিছু নতুনত্বের সন্ধান দিতে পারলে শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

সুজয় কুমার মণ্ডল

গবেষক আবাসন
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
মে, ১৯৯৯

বিষয়সূচি

প্রথম বলয়

(লোকসংস্কৃতি ও তত্ত্ব)

দ্বিতীয় বলয়

(লোকশিল্পকলা)

তৃতীয় বলয়

(মহান ব্যক্তিত্ব ও লোকসংস্কৃতি)

প্রথম বলয়

লোকসংস্কৃতি ও তত্ত্ব

- লোকসংস্কৃতিঃ ‘লোক’ ও ‘উপাদান’
- লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে Metafolklore
- মানুষের জীবনে নিষেধাজ্ঞা ঃ Taboo
  কারণ ও বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষিত

লোকসংস্কৃতি ঃ 'লোক' ও 'উপাদান'

'Culture is the man-made part of environment' অর্থাৎ মেলভিল জে. হারস্কোভিট্সের এই কথাগুলো অনুসারে পৃথিবীতে মানুষ বস্তুগতও ভাবগত যা কিছু তৈরী করেছে এবং নিজেকে ও প্রতিবেশকে যা কিছু দিয়ে বদলে নিয়েছে, সবই তার সংস্কৃতি। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'সংস্কৃতি' শব্দের অর্থ 'কর্ষণ' শব্দের অর্থ নির্দেশিত হয়। মানুষের জীবনভূমি ও চিত্তকর্ষণের ফলে সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে সংস্কৃতি হল সমাজের বা রাষ্ট্রের সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা 'উপসৌধ' বা 'Suprastructure'। আচার্য সুনীতি কুমারের ভাষায় – 'সভ্যতা তরু পুষ্প যেন সংস্কৃতি'। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবিকার বাস্তব উপকরণ, সমাজ, সমাজ সম্বন্ধ ও মানস সৌকর্যের অভিব্যক্তিতেই সংস্কৃতির বিকাশ। আর সেই বিকাশ ধারারই এক স্বচ্ছ সমান্তরাল ধারা হল লোকসংস্কৃতি। যা প্রধানতঃ লৌকিক বিশ্বাস – চিন্তন – মনন অর্থাৎ এককথায় লৌকিক জীবনকে ভিত্তি করেই প্রসার লাভ করে। লোকায়ত জীবনকেন্দ্রিক যাবতীয় সৃষ্টিকর্ম ও চিন্তাভাবনার আবর্তনেই লোকসংস্কৃতি আবর্তিত হয়।

আলোচনার ভিত্তিভূমি হিসেবে প্রাসঙ্গিকভাবেই কিছু প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে পড়ে। প্রথমতঃ 'লোকসংস্কৃতি' বলতে সুনির্দিষ্টভাবে আমরা কি বুঝি? দ্বিতীয়তঃ এখানে কোন 'লোকে'র কথা নির্দেশিত হচ্ছে? আর এ দুটি প্রশ্নের সমাধানের অনুষঙ্গেই অনায়াসেই চোখে পড়বে, লোকসংস্কৃতির বিষয়বস্তুই বা কি?

বর্তমানে আমরা বাংলা শব্দ 'লোকসংস্কৃতি' সম্পর্কে যা অনুভব করি – তার উৎস ১৮৪৬ সালে উইলিয়াম জন থমস্ (William John Thoms) লণ্ডনের 'এথনিয়াম' পত্রিকায় 'Folklore' শব্দের সর্ব প্রথম ব্যবহার। তিনি এ্যাংলো -স্যাক্সন 'Folk' শব্দের সঙ্গে 'lore' শব্দের সংযোগ সাধন করে 'Folklore' শব্দের উদ্ভাবন করেন। 'এ্যামব্রস মেরটন' এই ছদ্মনামে উইলিয়াম জন থমস্ 'Folklore' শব্দটি ঐ পত্রিকায় ব্যবহার করেন। এই শব্দের গঠনে আদর্শ হিসেবে কাজ করেছিল জার্মান শব্দ 'Volkskunde'।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে অর্থাৎ 'Folklore' শব্দের প্রথম ব্যবহারের পূর্বে লোকসংস্কৃতি (শুধুমাত্র বংশানুক্রমিক প্রচলিত প্রাচীন প্রথা বিশ্বাস প্রভৃতি) বোঝাতে ইংরেজি ভাষায় 'Popular Antiquities' শব্দটি প্রচলিত ছিল। সুতরাং বলা যেতে পারে আদিতে লোকসংস্কৃতি চর্চা ছিল জনপ্রিয় পুরাতনী চর্চা বা 'Popular Antiquities' এর অঙ্গ। অর্থাৎ লোকঐতিহ্যের মাধ্যমে অতীতের সৌরভময় সৌন্দর্য অবলোকনই ছিল 'জনপ্রিয় পুরাতনী চর্চা'র অনুবর্তন অনুশীলনের লক্ষ্য। ক্রমে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে এই পুরাতনী

চর্চার রোম্যান্টিক আবেগ অচিরে বিলুপ্ত হয় এবং বিষয়টি 'Folklore' শব্দের অর্থের দ্বারা ব্যাপকতা লাভ করে। এই শব্দটির ব্যবহার ও প্রচারের দ্বারা ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করতে সহায়ক হিসাবে ভূমিকা পালন করে লন্ডনের 'ফোকলোর সোসাইটি' (১৭৭৮) এবং আমেরিকার 'ফোকলোর সোসাইটি' (১৮৮৮)। বলাবাহুল্য 'Folklore' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। সেসব তর্ক-বিতর্কের উর্ধ্বে গিয়ে বহুল প্রচলনের সুবাদে বর্তমান প্রবন্ধে ঐ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

'লোকসংস্কৃতি' বা 'Folklore' কাকে বলবো – এ নিয়েও বহু তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশে এনিয়ে চর্চা বেশী হয়েছে। তবে ভারতীয় উপমহাদেশেও এ নিয়ে তর্কে পিছিয়ে নেই। এডওয়ার্ড মারিয়া লিচ (Edward Maria Leach) সম্পাদিত 'Standard Dictionary of Folklore, Mythology and legends'(1949) গ্রন্থে ২১টি সংজ্ঞার উল্লেখ রয়েছে। ফ্রান্সিস লিউটলে (Farncis Lee Utley) তাঁর একটি প্রবন্ধে সংজ্ঞা গুলো বিভাজন করে কতকগুলো 'মুখ্যশব্দ' বা 'Key-Words' পেয়েছেন যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সংজ্ঞায় স্থান পেয়েছে। যেমন – Oral, Tradition, Transmission, Communal ইত্যাদি। তাঁর মতে Oral এবং Tradition শব্দদ্বয় ১৩টি সংজ্ঞায় এবং Transmission শব্দটি ৬টি সংজ্ঞায় স্থান পেয়েছে।[১] অর্থাৎ 'Folklore' এর মধ্যে তাৎপর্যময় দিকগুলো হল —

১. লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্য নির্ভর।

২. লোকসংস্কৃতি মৌখিকভাবে বা হাতে-কলমে বংশানুক্রমে প্রবাহিত হয়।

৩. লোকসংস্কৃতি সমষ্টিমনের ফসল।

উপরোক্ত দিকগুলোর দেখা মিলবে ভারতীয় উপমহাদেশের বাতাবরণে গড়ে ওঠা সংজ্ঞাতেও। প্রথমতঃ

"Folklore is the total creation of the life practice and the ideotional-persuit of mainly collectively spontaneous and anonymous effort of an integrated Society"

অর্থাৎ সংক্ষেপে, লোকায়ত জীবন চর্যা ও মানস চর্চাই হল লোক সংস্কৃতি।

দ্বিতীয়তঃ ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে ইউনেস্কোর বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা প্রণীত 'Folklore' এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে –

" Folklore (in a broader sense traditional and popular folkculture) is a group oriented and tradition based creation of groups or individuals reflecting the expectations of the community as an adequate expression of its culture and social identity, its standards and values are transmitted orally by imitation or by other means. Its forms include among others language, literature, music, dance, games, mythology, rituals, customs, handicrafts. architecture and other arts."

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সমষ্টিগত জীবনপ্রয়াসে উদ্ভূত ও লৌকিক ঐতিহ্যে বিবর্তিত লোকসমাজের সজীব প্রবাহে লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ও প্রসার ঘটে। প্রকৃতপক্ষে লোকসংস্কৃতি সৃষ্টি হয় ঐতিহ্যগত রসচেতনা ও শিল্পসচেতনতা থেকে। আর এসবের ছাপ প্রতিফলিত হয় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় বা উপাদানের (genre-র) মধ্যে।

লোকসংস্কৃতি প্রাচীন কাল থেকে ভবিষ্যতের দিকে প্রবহমান। যার উৎস আদিম সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু। এই উৎসসূত্রের জোয়ারে বয়ে চলেছে নানা লোকায়ত আঙ্গিক। এ সর্ম্পকে Aurelio M. Espinosa খুব সুন্দর কথা বলেছেন—

"Folklore has very deep roots and its traces are ever present even among peoples that have reached a high state of culture. Folklore may be said to be a true and direct expression of the mind of "primitive" man." [২]

লোকসংস্কৃতি অতীতের বয়ে আসা প্রবহমান বিষয় হয়েও একটি জীবন্ত ধারা, যা রবীন্দ্রনাথের কথায়, প্রাচীন হয়েও চির নতুন। ঐতিহ্যময় এই বিষয় রূপান্তর-বিবর্তনের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে নিজের অভিযোজন ঘটিয়ে বেঁচে থাকে। যার জন্যই হয়ত মার্কিন লোকসংস্কৃতিবিদ সি. এফ. পটার (Charles Francis Poter) বলেছেন 'Folklore is a lively fossil which refuses to die.' [৩] অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি জীবন্ত জীবাশ্ম — যার বিনাশ নেই। রুশ লোকসংস্কৃতিবিদ Y.M. Sokolov এ প্রসঙ্গে খুব গুরুত্ব পূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছেন— "Folklore is an echo of the past, and at the same time it is the vigorous voice of the present. "[৪] অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি অতীতের প্রতিধ্বনি হয়েও বর্তমানের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। আবার R.V. Williams জানিয়েছেন — " It (Folklore) is like a forest tree with its roots deeply buried in the past, but which continually put forth new branches, new leaves, new fruits" [৫]

একথার সারমর্ম হল - লোকসংস্কৃতি একটি বনবৃক্ষের মত। এর শিকড় অতীতের গভীরে প্রোথিত, কিন্তু তা ক্রমাগত নতুন শাখা, নতুন পাতা ও ফল সৃজন করে চলেছে।

লোকসংস্কৃতি লোকায়ত সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। আবার লোকায়তসমাজ আবর্তিত হয় 'লোক' কে (Folk কে) কেন্দ্র করে। তাই এবারে প্রশ্ন এই 'লোক' বা 'Folk' কারা? অথবা 'লোক' কাদের বলবো?

'লোক' এর ব্যুৎপত্তি 'লোক্' ধাতু থেকে। যার অর্থ দর্শন। অর্থাৎ 'লোক' এর ধাতুগত অর্থ হল 'দর্শনক্ষম ব্যক্তি'। আবার সংস্কৃত অভিধানে দেখা যায় 'লোকস্তু ভুবনে জনে' অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'লোক' শব্দ দ্বারা 'মানুষ' এবং 'পৃথিবী' দুই-ই নির্দেশ করছে। কাজেই এরকম অনুমান করাটা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, আদিতে 'লোক' এবং 'পৃথিবী' ছিল সমার্থক এবং পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ছিল। আবার ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে — " স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততস্পশ্যত্।

ইন্দ দর্শনিতি।।"

অর্থাৎ 'লোক' এর মৌলিক উপাদান হলো ইন্দ্রিয়, এবং ইন্দ্রিয় হ'লো প্রকৃতিকে দর্শন ও উপভোগ করার মাধ্যম। আর প্রতি মুহূর্তেই প্রকৃতিকে গভীর ভাবে দর্শন ও নিবিড়ভাবে উপভোগ করার ফলে মানুষের অন্তর্লোকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব সংস্কারের জন্ম দেয় — তারই প্রাচীন সংস্কার হ'লো - প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্যতার সংস্কার, একাত্মতার সংস্কার। অর্থাৎ 'লোক' এর প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো অবিচ্ছিন্নতা বা সংহতি।

অপরদিকে, ইংরাজী 'Folk' শব্দের অর্থ 'Webster's New Collegiate Dictionary' গ্রন্থে রয়েছে —

"The great proportion of the members of a people that determines the group character and that tends to preserve its characteristics form of civilisation and its customs, arts and crafts, legends, traditions and superstitions from generation to generation." [৬]

অর্থাৎ 'লোক' (Folk) হল সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ যারা গোষ্ঠী চরিত্র প্রতিপালন করে এবং সভ্যতা প্রথা, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, পুরাণ, চারু ও কারুশিল্পের বিশিষ্ট রূপকে বংশ পরম্পরায় ধরে রাখে।

নৃতাত্ত্বিকরা 'Folk' সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন "Folk in ethnology is the common people who share a basic store of old tradition" [৭] এছাড়া অপর একটি নৃতাত্ত্বিক অভিধান, " Dictionary of Anthropology" (1956) তে 'Folk' এর তিন ধরনের অর্থ চিহ্নিত করেছে —

প্রথমত: সমস্বার্থে সংহত জনগোষ্ঠী অর্থাৎ 'a group of associated people'।

দ্বিতীয়ত : উপজাতি-উত্তর একপ্রকার সমাজ সংগঠন অর্থাৎ 'a primitive kind of Post-tribal Social organisation'।

তৃতীয়ত: একটি অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর বা সাধারণ শ্রেণীর মানুষ অর্থাৎ 'The lower classes or Common People of an area'। [৮]

আবার 'Encyclopaedia of Anthropology' (1976) গ্রন্থে 'Folk' এর ব্যাখ্যা এভাবে রয়েছে —

"A less ethnocentric and broader definition of folk would be any group of people who share at least one common factor (for example, common occupation, religion or ethnicity)".[৯]

এক্ষেত্রে বৃত্তি, ধর্ম, জাতিতত্ত্বের অন্তত একটি বিষয়ের অংশীদার জনগোষ্ঠীকে বৃহত্তর অর্থে 'লোক' বলা হয়েছে।

এবারে দেখা যাক লোকসংস্কৃতিবিদরা (Folklorist রা) 'Folk' সম্পর্কে কি বলেন। লোকসংস্কৃতিবিদরা মনে করেন নৃতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে লোকসমাজ সংহত অর্থাৎ Integrated. এব্যাপারে ড. ওয়াকিল আহমেদ (বাংলাদেশ) 'homogeneous' বা 'সমভাবাপন্ন' [১০] শব্দটির ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার 'Encyclopaedia of Anthropology' গ্রন্থের 'Folk' এর ব্যাখ্যার প্রতিধ্বনি শোনা যায় আমেরিকার বিদগ্ধ লোকসংস্কৃতিবিদ অ্যালান ডাণ্ডিসের (Alan Dundes) ভাষায় —

" The term folk can refer to any group of people whatsoever who share at least one common factor, it does not matter what the linking factor is – it could be a common occupation language or religion - but what is important is that a group form for what ever reason will have some traditions which it calls its own."

ডাণ্ডিস সাহেব তাঁর 'Interpreting folklore' গ্রন্থে আর একটি ধারণার উপস্থাপনা করেছেন। তাঁর মতে 'more than one can form a society' অর্থাৎ একের বেশী মানুষ যদি ভাষাগতভাবে অথবা ধর্মাচরণে অথবা প্রথায় অথবা সংস্কারে একই রূপ আচরণ করে তবে সেই একের বেশী মানুষকে নিয়ে তৈরী হতে পারে 'Folk' বা 'লোক' বা লোকসমাজ।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একই রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী একের বেশী মানুষ নিয়ে তৈরী হতে পারে 'Folk' বা 'লোকসমাজ'। তেমনি ভাবে একই শ্রেণী কক্ষে পাঠরত একের বেশী ছাত্র-ছাত্রী যখন একই পাঠক্রম অনুসরণ করে তখন শ্রেণী কক্ষের ভিতর তারা 'Folk'। অর্থাৎ 'Folk' হিসাবে গণ্য হতে গেলে একই অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, একই ভৌগোলিক পরিবেশ, বা একই রকম আচরণ বা একই প্রথায় বিশ্বাসী হতে হবে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই, শুধুমাত্র যে কোন একটি বিষয়ে সমরূপতা থাকলেই একের বেশী মানুষ 'লোক' বা 'Folk' হতে পারেন — এটাই ডাণ্ডিসের তত্ত্বের মূল কথা। তবে তিনি ঐতিহ্যের কথাকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। এবং 'লোক' মানেই অশিক্ষিত নিরক্ষর হবে — এই পুরনো ধারনারও কোন ভিত্তি নেই বলে তিনি জানিয়েছেন।

তবে Alan Dundes এর উপরোক্ত তত্ত্বের বিশ্লেষণ করলে আমাদের কাছে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় 'লোক' বা 'Folk' সম্পর্কে। যেমন - ইতিহাসের একটি মৌলিক সত্য হল সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন যাত্রার ধরন-ধারণও পাল্টে যায় এবং সেই সঙ্গে পরিবর্তন ঘটে তার সামাজিক অভিব্যক্তি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই পরিবর্তন নেহাৎই বহিরঙ্গের — লোকজীবনের শিকড়ে যে বহুকালীন ঐতিহ্য চেতনা সুপ্ত রয়েছে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে চেতনে অবচেতনে মানুষ তার অনুসারী হয়। তাই তখনও একজন শহুরে শিক্ষিত মানুষ যখন কথা বলেন প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি বাদ দিয়ে কথা বলতে পারেন না। লোকসংস্কৃতির ভাবরেণুগুলি শহরের মানুষের অন্দরমহলে যে কি পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে তার প্রমাণ মেলে বিয়ে-বাড়ীর আচার-অনুষ্ঠানে বা যে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে। সেই কারণেই আজও একজন পল্লীগ্রামের মানুষ যে সংস্কারে বিশ্বাস করেন, সেই একই রকম সংস্কার একজন শহুরে উচ্চশিক্ষিত শিল্পী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা এমনকি খেলোয়াড়দেরও আমরা আবদ্ধ হতে দেখি। কারণ সংস্কৃতিকে গ্রাম-শহরের কৃত্রিম গণ্ডীতে বেঁধে রাখা যায়না। সংস্কৃতি মানুষের মানস রাজ্যের অভিব্যক্তি। তাই লোকসংস্কৃতিকে গ্রামীণ হতে হবে তা কিন্তু নয়, ' লোক' সম্পর্কিত পুরানো এই ভুলধারণা সম্পর্কিত Dundes এর ব্যাখ্যা যথার্থ।

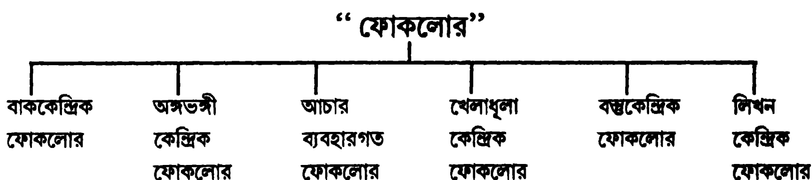
উপরোক্ত বিস্তৃত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে বসবাসকারী মানুষ যখন বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত একই ধরনের আচার, আচরণ খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদে অভ্যস্ত হয়, — তাদের ভাবা, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্যকলা, লৌকিক দেবদেবী, লোকাভিনয়, বিশ্বাস সংস্কার যখন একই জীবনের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট করে — অর্থাৎ একই রকম রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যখন তাদের দৈনন্দিন জীবন দোলায়িত হয়, তখনই সেই ঐতিহ্যনির্ভর অবিচ্ছেদ্য ও সংহতগোষ্ঠী 'লোক' বলে বিবেচিত হয় এবং 'লোক'কে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে

ওঠে তা 'লোক সংস্কৃতি' বা Folklore.

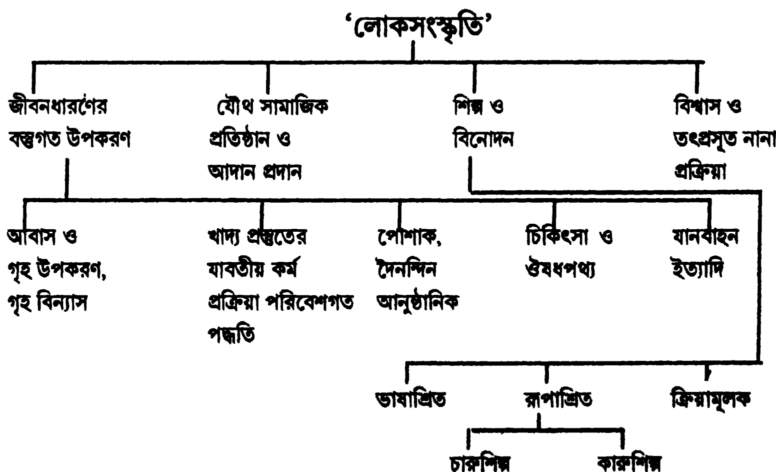
'Folklore' শব্দের 'Folk' শব্দটি বাদ দিলে 'Lore' অংশটি বাকি থাকে। যার আভিধানিক অর্থ 'Body of traditions', 'Knowledge relating to some subject' অর্থাৎ কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান — যা ঐতিহ্যমিশ্রিত। এই সূত্রে বলা যায়, 'Lore' এর পরিপ্রেক্ষিতেও 'Folk' চিহ্নিত করা যায়। 'Lore' প্রকাশ পায় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান (genre) - এর মাধ্যমে। তাই উপাদান কে কেন্দ্র করে বিশ্লেষণে গেলে 'Folk' বা 'লোক' চিহ্নিত করণ সহজতর হবে। এবার প্রাসঙ্গিক ভাবেই লোকসংস্কৃতির বিষয়সীমা বা উপাদানের বলয়ে প্রবেশ করা যাক।

লোকসংস্কৃতির বিষয় সীমাকে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভাজন করেছেন। তারই কয়েকটি বিভাজন উল্লেখ করে, পরিশেষে সামগ্রিকভাবে লোকসংস্কৃতির বিষয়সীমাকে নির্দেশ বা চিহ্নিত করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ ড. মযহারুল ইসলাম লোকসংস্কৃতিকে নিম্নরূপে বিভাজন করেছেন [১১]—



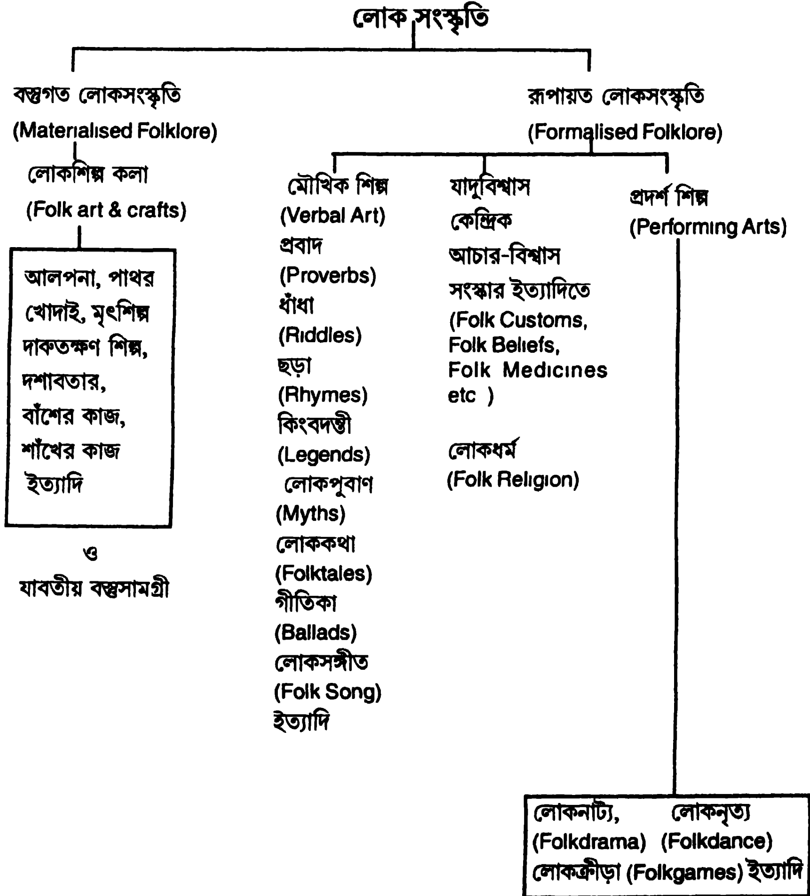
আবার ড. পবিত্র সরকার লোকসংস্কৃতির বিষয় সীমাকে এভাবে বিভাজন করেছেন [১৩]



তবে সামগ্রিক ভাবে লোকসংস্কৃতিকে দুটি পর্যায়ে বিভাজন করা যেতে পারে —

১। বস্তুগত লোকসংস্কৃতি বা Materialised Folklore.

২। রূপায়ত লোকসংস্কৃতি বা Formalised Folklore.



পরিশেষে, রবীন্দ্রনাথের কথার অনুসরণে বলা যেতে পারে, লোকায়ত মানুষের হয়ে ওঠার ইতিহাসই লোকসংস্কৃতি। কাজেই লোকসংস্কৃতির বিষয়সীমাকে বাঁধা-ধরা গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না। লোকসংস্কৃতির অর্থও যেমন ব্যাপক, তেমনি ব্যাপক এর বিষয় সীমা। এই বিষয়সীমাই 'Lore' এর – অভিব্যক্তি। তাই 'Lore' কে অনুভব করতে পারলে *'Folk' এর অর্থও যেমন অনুভব করা যাবে, তেমনি চিনতেও কোন অসুবিধা থাকবে না।*

পূর্বের মত আবারও বলতে হয় লোকায়ত জীবন কেন্দ্রিক টানাপোড়েনেই লোকসংস্কৃতির উৎসার - প্রসার - আবর্তন, যা সুইডিশ জাতিতত্ত্ববিদ Sigurd Erixol এর ভাষায় সম্পূর্ণতা পায় —

"The Science of man as Cultural being."

দ্রষ্টব্য :

১। Francis Lee utley : 'Folk Literature : An operational Definition', The study of Folklore (Alan Dundes edited) 1965,P.8

২। Edward Maria Leach (edited), Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legends, New York, 1949, P-399.

৩। Ibid, P-401

৪। Y. M. Sokolov, Russian Folklore, New York, 1950, P-15,

৫। R.V. Williams, 'Folklore, Encyclopeadia Britannica, Chicago, 1992.

৬। Webster's New Collegiate Dictionary 8th Edition

৭। International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore, Vol. Copenhagen, 1960, P,126

৮। Charles Wirck (edited) Dictionary of Anthropology, 1956, P.217

৯। David E. Hunter and phillip Whiten (edited) Encyclopeadia of Anthropology, 1976, P-173

১০। ড. ওয়াকিল আহমদ, লোক কলা তত্ত্ব ও মতবাদ, ঢাকা, প্রথম সংখ্যা কার্তিক, ১৪০৪

১১। Alan Dundes, 'Interpreting Folklore', Bloomington, 1980, P, 6-7

১২। ড. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৩, পৃ : ২০-২৮

১৩। ড. পবিত্র সরকার, লোকসংস্কৃতির বিষয় সীমা, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, সম্পা: ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, কলকাতা, ১৯৯৫।

লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে 'Metafolklore'

'Folklore' বা 'লোকসংস্কৃতি' পঠন-পাঠনের বা অনুশীলনের ক্ষেত্রে একটি নবীন তত্ত্ব হল 'Metafolklore' বা পরালোকসংস্কৃতি। যার সারমর্ম হল – লোকসংস্কৃতির লোকজাত অর্থ অনুধাবন। আরো সহজ করে বলা যায়, লোকসংস্কৃতির অন্তরে যে অর্থ নিহিত থাকে, সেই অর্থই হল 'Metafolklore' । অর্থাৎ লোকের (folk এর) চোখ দিয়ে লোকসংস্কৃতি দেখা বা মূল্যায়ন। যারা লোকসংস্কৃতি সৃষ্টি করে ও চর্চা করে বা লালন-পালন করে, তাদের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা কি? সেই ধাবণাকে বিচার-বিবেচনায় এনে তার সামগ্রিক মূল্যায়ন করাই এই তত্ত্বের মূলকথা। তবে এ বিষয়টি অবশ্যই ঘটবে লোকসংস্কৃতির সেই উপাদানের (Genre-র) 'Contextual Situation' বা পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। ফলে অনিবার্যভাবেই ধরা পড়বে লোকসমাজে লোকসংস্কৃতির সেই উপাদানের (Genre-র) স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে 'ক্রিয়াশীলতা' বা 'Functions'।

'Metafolklore' তত্ত্বকে বিস্তৃতভাবে জানার আগে প্রাসঙ্গিকভাবেই জেনে নিতে হয় এই শব্দের উৎসকথা। ১৯৬৪ সালে আমেরিকান দিশান্তকারী লোকসংস্কৃতিবিদ এ্যালান ডাণ্ডিস (Alan Dundes) 'Southern Folklore Quaterly' [XXVIII, P-252] -তে প্রথম 'Metafolklore' শব্দটি ব্যবহার বা চয়ন করেন। তিনি ভাষাবিজ্ঞানের 'Metalanguage' - এর অনুসরণে 'Metafolklore' শব্দের গঠন করেন। যার প্রামাণিক আলেখ্য এ্যালান ডাণ্ডিস সাহেবের কথায় —

"As there is a term analogus to refer to linguistic statements about language. so we may suggest metafolklore to refer to folkloristic statements about folklore."

এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেটাফোকলোরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পরিবেশ পরিস্থিতিগত পঠন পাঠনের গুরুত্বও অনুভব করেছেন —

"One can not get exact meaning from the text or even from the context under which a folklore - genre is presented or performed. For this reason Folklorist must actively seek to elicit the meaning of folklore from the folk."

এই বিষয়টি অনুভবের সময় তিনি মেটাফোকলোরের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দিকও তুলে ধরেন, যা হল – 'Oral literary criticism' বা 'মৌখিক সাহিত্য

সমালোচনা'। এটা মেটাফোকলোরের একটি অন্তর্নিহিত পর্যায়। এ প্রসঙ্গে পরের দিকে বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করা যাবে। আবার পূর্বের কথায় আসা যাক।

লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রগবেষণার (Field Work) ক্ষেত্রে 'Metafolklore' একটি অপরিহার্য তত্ত্ব। অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির মৌলিক উপাদান (Genre) সংগ্রহে এ বিষয়টি একান্ত প্রয়োজন। কেন না, লোকসংস্কৃতির মৌলিক উপাদান সমূহ সংগ্রহের সময় তৎসংশ্লিষ্ট পরালোকসংস্কৃতিগত উপাদানগুলি বা তথ্য সংগ্রহ করা না হলে লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক বিচারে অসম্পূর্ণতা রয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সুইডেনের লোকসংস্কৃতিবিদ কার্ল - উইলহেলম ভন সিডো ('Carl Wilhelm Van Sydo) প্রবর্তিত 'সক্রিয় ঐতিহ্যবাহক' বা 'Active Tradition Bearer' এবং 'নিষ্ক্রিয় ঐতিহ্যবাহক' বা 'Passive Tradition Bearer' শব্দনাম দুটির কথা স্মরণে আসে। যারা লোকসংস্কৃতি সৃজনে ও চর্চায় সরাসরি জড়িত তারা 'সক্রিয় ঐতিহ্যবাহক'। যেমন — কথক, বয়াতি, কবিয়াল, দোহার, সরকার, গায়েন, সূত্রধর, ছোকরা, রসিক, লোকশিল্পী (Artisen) ইত্যাদি। অপরদিকে যারা লোকসংস্কৃতির কোন বিষয় দেখে ও শুনে শিখে এবং অন্যের কাছে তা প্রচার করে বা প্রসার করতে সাহায্য করে — তারা 'নিষ্ক্রিয় ঐতিহ্যবাহক'। এ বিষয়টিকে শুধু মাত্র 'লোককথা'কে কেন্দ্র করে একটু অন্য ভাবে বলা যায় — লোককথার কথক 'সক্রিয় ঐতিহ্যবাহক' এবং বিভিন্ন লোককথার সংগ্রহের সংকলন গ্রন্থ 'নিষ্ক্রিয় ঐতিহ্যবাহক', যেমন ধরা যাক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র 'Folktales of Bengal' গ্রন্থটি বা A. K. Ramanujan (রামানুজন) এর 'Folktales From India' গ্রন্থটি। এক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির 'নিষ্ক্রিয় ঐতিহ্যবাহক' হিসেবে বিভিন্ন মাধ্যম (Media) কার্যকরী।

কাজেই, প্রথম পর্যায়টি অর্থাৎ 'সক্রিয় ঐতিহ্যবাহক' লৌকিক উপাদানের অর্থ (Meaning) ও পরিবেশ-পরিস্থিতিগত প্রসঙ্গ (Context) সম্পর্কে যতখানি সঠিক তথ্য সরবরাহ করবে, দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ 'নিষ্ক্রিয় ঐতিহ্য বাহক' ততখানি তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম নয়। সুতরাং মূলপাঠ বা Text এবং পাঠ-সংক্রান্ত প্রসঙ্গ বা Context সংগ্রহে লোকসংস্কৃতির গবেষকদের সচেতন দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন রয়েছে। বলাবাহুল্য মূলপাঠ ও মূলপাঠসংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য একত্রে মিলে 'Metafolklore' গত অনুশীলন সম্পূর্ণতা লাভ করবে, একই সঙ্গে সম্পূর্ণতা লাভ করবে লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক মূল্যায়ন। যা এ্যালান ডাণ্ডিসের কলমে —

"The current interest in the collection of context ..... has partially obscured the equally necessary and important task of collecting the meaning (s) of folklore. One must distinguish between use and meaning. The collection of context and preferably

a number of different contexts for the same item of folklore is certainly helpful in ascertaining the meaning of an item of folklore. But it can not be assumed the collection of context perse automatically ensures the collection of meaning ..... For this reason, folklorists must actively seek to elicit the meaning of folklore from the folk.'[১]

Metafolklore তত্ত্বের আলোচনায় বারবার এ কথাই ধ্বনিত হয় যে, মেটাফোকলোরগত উপাদান বলতে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের নিজস্ব ধ্যানধারণা বোঝায়। যার কাঠামোতে প্রধানভাবে রয়েছে —

ক. 'মৌখিক সাহিত্য সমালোচনা' বা 'Oral Literary Criticism.'

খ. 'ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য' বা 'Explanatory Commentary.'

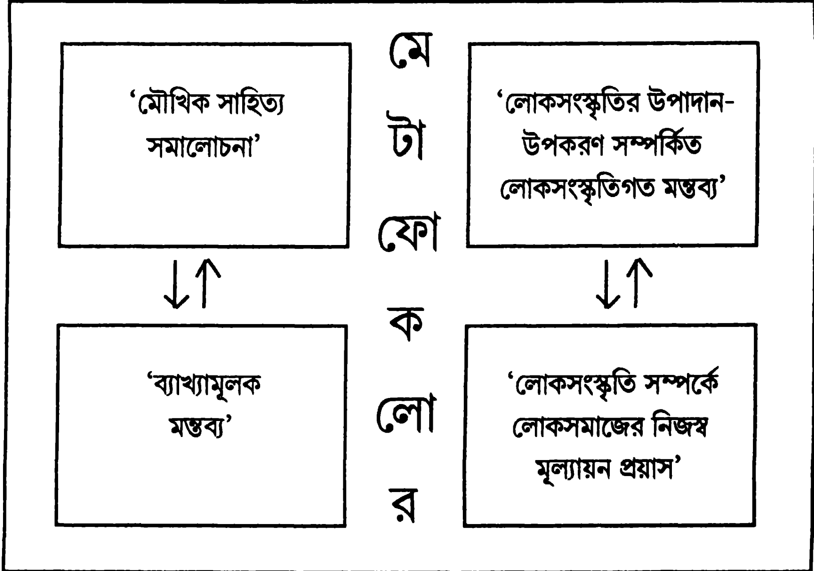
গ. 'লোকসংস্কৃতির উপাদান-উপকরণ সম্পর্কিত লোকসংস্কৃতিগত মন্তব্য' বা 'Folkloristic Commentary about a folklore genre.'

ঘ. 'লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসমাজের নিজস্ব মূল্যায়ন প্রয়াস' বা 'Folk's evaluation of their folklore.'

প্রসঙ্গক্রমে প্রণিধানযোগ্য মার্কিন নৃতত্ত্ববিদ কিরিন নারায়নের (Kirin Narayan) 'The practice of oral literary criticism : Women's songs in Kangra, India' প্রবন্ধে ডাণ্ডিস সাহেবের মেটাফোকলোর তত্ত্বের প্রসঙ্গে তার ধারণার ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য —

"Dundes goes on to list several planes along which indigenous meanings might be elaborated : (1) metafolklore, that is, folklore about folklore, such as a proverb about proverbs that reveals how the genre is indigenously conceived; (2) raconteurs asides and explanatory commentary during performance; and (3) systematic exegesis from raconteurs and their audiences. Additionally, Dundes acknowledges that since symbols employed in folklore may have unconscious associations, the folk can not always openly articulate meanings. Instead, meaning must also be pieced together through (4) the efforts of the analyst, who situates symbols from the text under consideration in light of other significant Contexts in which these are employed"[২]

কিরিন নারায়ন কাংড়া অঞ্চলের রমণীদের গানের উপর মেটাফোকলোরগত অনুসন্ধান করে, ঐ অঞ্চলে প্রচলিত লোকসঙ্গীত ও প্রবাদের পরালোকসংস্কৃতিগত মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর এই কর্মপ্রয়াসে একই সঙ্গে ধরা পড়েছে, কাংড়া অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের Text, Context এবং Texture। যাই হোক, আমরা পরালোকসংস্কৃতির বা মেটাফোকলোরের কাঠামো প্রসঙ্গে যে চারটি ধারণার কথা বলেছি – যে গুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, রেখাচিত্রের মাধ্যমে এভাবে দেখানো যেতে পারে —



অর্থাৎ 'মৌখিকসাহিত্য সমালোচনা' ও 'ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য' যেমন পরস্পরমুখী তেমনিভাবে 'লোকসংস্কৃতির উপাদান-উপকরণ সম্পর্কিত লোকসংস্কৃতিগত মন্তব্য' ও 'লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসমাজের নিজস্ব মূল্যায়ন প্রয়াস' পরস্পরমুখী। বলাবাহুল্য এই চারটি পর্যায়ের মধ্যে যে একেবারেই সাযুজ্য নেই – তা কিন্তু নয়, কখনও কখনও Overlaping ও ঘটতে পারে বা ঘটে থাকে। এবারে উপরোক্ত চারটি পর্যায়ের দৃষ্টান্তসহ বিশ্লেষণ করা যাক।

ক. 'মৌখিক সাহিত্য সমালোচনা' (Oral Literary Commentary):

অনেক সময় দেখা যায় যে লোকায়ত উপাদানের মধ্যেই লোক (Folk) মূল বিষয়টিকে কিভাবে দেখছে, তার মূল্যায়ন রয়েছে। অর্থাৎ স্রষ্টা বা

ধারক ও বাহক নিজেই সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এ্যালান ডাণ্ডিস একেই 'মৌখিক সাহিত্য সমালোচনা' বা 'Oral Literary Criticism' বলেছেন –

"As a terminological aid for the collection of meaning, I have proposed 'oral literary criticism'. The term is obviously derived from literary criticism which refers to a host of methods of analysing and interpreting works of written literature."[৩]

লোকসংস্কৃতির একটি অন্যতম ধর্ম হল পরিবর্তন বা বিবর্তন। সুতরাং লোকসংস্কৃতির উপাদান উপকরণ সমূহ যেমন বংশানুক্রমে পরিবর্তিত হয় তেমনি লোকসংস্কৃতির উপাদান সম্পর্কিত অর্থ ও ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যাও পাল্টিয়ে যায়। 'মৌখিক সাহিত্য সমালোচনা' অনুষঙ্গে উপরোক্ত ধারণার স্পষ্টতা পাবে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ ড. মযহারুল ইসলাম বাংলা প্রবাদ ও ছড়া থেকে মেটাফোকলোরের যে অনুসন্ধানমূলক প্রয়াস করেছেন, তা স্মরণযোগ্য।

প্রবাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় –

মূলপাঠ : ১. 'ভাতারের নাই আদর, মুখে দেয় চাদর'।

২. 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী'।

৩. 'যদি হয় সুজনা, তেঁতুল পাতায় ন'জনা'।

প্রবাদ গুলোর অপর পাঠ ঃ

১. ভাতারের নাই আদর, মুখে দেয় চাদ্দর।
জঙ্গলের বাইরে য্যান ঘুরে বেড়ান বাঁদর।।

২. অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী
কথায় কথায় ডিকশনারি।

৩. যদি হয় সুজনা তেঁতুল পাতায় ন'জনা
বুঝে রেখো লোকজনা।।

এক্ষেত্রে ড. ইসলাম উপরোক্ত উল্লিখিত প্রবাদের সংযোজিত বাক্যগুলোকে 'Metafolklore' বলেছেন। প্রতিটি প্রবাদের সংযোজনের মাধ্যমে ঐ নির্দিষ্ট প্রবাদের

সমালোচক মূলক ব্যাখ্যা আরো সুদৃঢ় হয়েছে। এ্যালান ডাণ্ডিসও একেই মৌখিক সাহিত্য সমালোচনা বলেছেন। আবার অনেক প্রবাদে অতিরিক্ত বাক্যের সংযোজনের প্রয়োজন হয়নি। প্রবাদ তার মূল গঠনেই নিজের ব্যাখ্যা বহন করে –

১. ' তেলা মাথায় তেল দেওয়া '।

২. ' মাছের তেলে মাছ ভাজা '।

৩. ' ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে '।

এই সব স্বব্যাখ্যাত প্রবাদগুলোও 'মেটাফোকলোর'। ড. ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেন — "প্রবাদ যারা সৃষ্টি করে তাদের মুখে প্রবাদটিরও কিভাবে ব্যবহার হয় এবং সঙ্গে তারা যে অর্থ প্রকাশ করে সেই অর্থকে জানতে পারাটাই মেটাফোকলোরগত আলোচনার উদ্দেশ্য।"[৪]

প্রাসঙ্গিকভাবে ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কির উদ্ভাবনকে সামনে রেখে 'Metafolklore' এর আর একটি দিক তুলে ধরা যেতে পারে। কাজেই প্রথমেই জেনে নিই চমস্কির কোন উদ্ভাবনের কথা বলা হচ্ছে। চমস্কি বলেছেন —

"A grammar is to find out the device of some sort for producing the sentences of language. The grammar of a language should generate all and only the sentences of languages."[৫]

চমস্কির উপরোক্ত বক্তব্যের অনুষঙ্গেই দেখান – 'Syntatic Structure' থেকে 'Transformational aspect' এর মাধ্যমে মৌলিক বাক্য বা 'Karnel Sentence' এর উদ্ভাবন। স্বাভাবিক ভাবেই এবার প্রশ্ন উঠতে পারে 'Karnel Sentence' বা 'মৌলিক বাক্য' কি? মৌলিক বাক্য হল সেই বাক্য যে বাক্য আরো বাক্যগঠন করবার শক্তি রাখে। যা একটি ভাষার মূল প্রাণ। যেমন –

১. 'খেয়া ঘাটের ধারে, দেরীতে আসে পাড়ে'।

২. 'মসজিদের কাছে, নামাজে আসে পাছে'।

৩. 'ইষ্টিশনের ধারে, গাড়ী ধরতে নারে'।

অথবা

১. 'যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন'জন'।

২. 'যদি হয় সুজন, এক ঘরে ন'জন'।

৩. 'যদি হয় কুজন, নয় ঘরে একজন'।

এক্ষেত্রে এ দুটি দৃষ্টান্তের মধ্যে মৌলিক বাক্য (প্রবাদ) হল ' খেয়া ঘাটের ধারে, দেরীতে আসে পাড়ে ' এবং ' যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন'জন '। পরের বাক্যগুলি নবসৃষ্টির দৃষ্টান্ত বা 'Metafolklore' ।

ছড়ার ক্ষেত্রেও মেটাফোকলোর খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন –

" তাই তাই তাই
মামা বাড়ি যাই
মামা দিল দুধভাত দোরে বসে খাই
মামি এলো লাঠি নিয়ে পালাই পালাই
এরে ভাই আর কি কভু যাই? "

এই ছড়াটি প্রসঙ্গে ড. ইসলাম জানান —

" এই ছড়ায় মামা এবং মামির আচরণের মাধ্যমে লোকেদের ধারণা সুস্পষ্ট এবং বিষয়টি লোকদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে স্বয়ং বিশ্লেষিত। কিন্তু শেষের বাক্যে লোকদের ধারণা আরো প্রকট হয়েছে, বাক্যটি পরবর্তী কালের সংযোজন। এইটি আসলে মৌখিক সমালোচনা এবং ফোকলোরের ফোকলোর। ফোকলোরের বহু উপাদানের মধ্যে এই ধরনের বিশ্লেষণ, সমালোচনা ও ফোকলোর সম্পর্কে সৃজিত ফোকলোর বিদ্যমান।"৬

ধাঁধার ক্ষেত্রেও মেটাফোকলোরের বহু দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। ধাঁধার মধ্যেও ব্যাখ্যা প্রদানের প্রবণতা রয়েছে। ধাঁধায় ব্যাখ্যা-সূত্র আবশ্যক, কেননা উত্তরটি ঐ ব্যাখ্যা সূত্রে নিহিত থাকে।

যেমন,

১। " আঁখির ভিতর পাখির বাসা
জল ডুবে ডুবে খায়।
চার পার উপর শিকার পড়লো
দু-পায় নিল তায়।"

(উত্তর : চিল ও মাছ)

২। " লোহায় লোহা কাটে,
কাঠে কাটে কাঠ,
উঁচু করে মারলো ধীবর দিয়ে এক লাফ।"
(উত্তর : কুড়াল)

৩। ' খেলে খাড়ো, না খেলে জড়ো।'
(উত্তর : বস্তা)

৪। "ইটা হনে ছেমড়ি
নায় না ধোয় না, তাও সুন্দরী।"
(উত্তর : রসুন)

৫। " শাঁখ নদীর পাঁক নাই,
জল থাকতে মাছ নাই।"
(উত্তর : নারকেল)

৬। " ধলা কন্যা / ধলা হাড়ি
জ্বলিয়া মরে / খোদার বাড়ি "
(উত্তর : মোমবাতি) ইত্যাদি।

খ. 'ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য' (Explanatory Commentary) ঃ

'ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য' অনেকটা মৌখিক সাহিত্য সমালোচনার পর্যায়ভুক্ত। এর বিচরণ লোকসাহিত্যের বলয়ে অবাধ হলেও লোকসংস্কৃতির অন্যান্য উপাদান সম্পর্কেও ব্যাখ্যাদান করে না — তা কিন্তু নয়। এ পর্যায়ের সবচেয়ে বড় কথা হল লোকসংস্কৃতির কোন আঙ্গিক প্রদর্শের (Performance) সময় যে ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য পাওয়া যায় -তা। যেমন, কোন 'কথক' লোক কথা পরিবেশন করছে বা অনেককে বলছে, তখন সেই গল্প সম্পর্কে সেই মন্তব্যও Metafolklore এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এ বিষয় টি যেমন লোককথার কথকের উপরে কার্যকরী হয়, তেমনি কার্যকরী হয় নৃত্য-গীত-নাট্য-ক্রীড়া-আচার প্রভৃতির ক্ষেত্রেও। Metafolklore এর এই পর্যায়ে লোকসংস্কৃতির প্রদর্শকের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হয়।

গ. লোকসংস্কৃতির উপাদান - উপকরণ সম্পর্কিত লোকসংস্কৃতিগত মন্তব্য (Folkloristic Commentary about a Folklore genre.) ঃ

Metafolklore এর এই পর্যায়ে লোকসংস্কৃতির কোন আঙ্গিকের প্রদর্শক (Performer) এবং সেই আঙ্গিকের দর্শক বা শ্রোতা (Audience) - দুইএরই সমান

গুরুত্ব। লোকসংস্কৃতির কোন উপাদান-উপকরণ সম্পর্কিত স্রষ্টার মন্তব্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ, সেই উপাদান-উপকরণের দর্শক বা শ্রোতার মন্তব্য। যেমন, লোকশিল্পে ব্যাপকভাবে প্রতীকের আকারে 'Motif' ব্যবহৃত হয়। এই সব motif এর অন্তরে গূঢ় অর্থ থাকে। যে অর্থ সৃজনশীল শিল্পীরা দিতে পারে। অনেকক্ষেত্রে আবার নাও পারে - তখন বিভিন্ন শিল্পীর সম্মিলিত প্রয়াসে যেমন motif এর অর্থ লাভ করা যেতে পারে, আবার দর্শকদের (এক্ষেত্রে লোকশিল্প ব্যবহার কারীর) পক্ষ থেকেও অর্থ পাওয়া যেতে পারে। তবে এসবই ঘটবে সেই আঙ্গিকের পরিবেশ - পরিস্থিতির অবস্থাকে (Context) কেন্দ্র করে।

ঘ. লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসমাজের নিজস্ব মূল্যায়ন প্রয়াস (Folk's evaluation of their folklore) ঃ

লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসমাজের সামগ্রিক বা সমষ্টিগত মূল্যায়ন, লোকসংস্কৃতির অনুশীলনে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। লোকসমাজের নিজস্ব মূল্যায়ন ও লোকসংস্কৃতিবিদদের মূল্যায়ন মিলে — বিশ্লেষণের সম্পূর্ণতা পাবে। লোকসংস্কৃতির যে কোন বিষয়ের উপর এই মূল্যায়ন যেমন হতে পারে তেমন সামগ্রিক ভাবেও লোকসংস্কৃতির মূল্যায়ন হতে পারে। তবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগতভাবে মতামত সংগ্রহ করে সামগ্রিক মূল্যায়নে প্রয়াসী হওয়া যেতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে। সাম্প্রতিক কালে লোকসংস্কৃতির নানা পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে বা দিয়েছে। এর কারণ নির্ণয়ে লোকসমাজের সদস্যদের মতামত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, তাদের নিজস্ব সমস্যা তারাই ভালো করে জানবে। এক্ষেত্রে ব্যাপক সমীক্ষার প্রয়োজন।

আমাদের একটি এধরনের সমীক্ষায় (সৌজন্যে C.C.C.A. এর আর্থ-সামাজিক -সাংস্কৃতিক সমীক্ষার প্রতিবেদন) পশ্চিমবঙ্গের ৫টি জেলার ৬৪ টি গ্রামকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। জেলাগুলি হল - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া, ওবীরভূম। এই সব জেলার গ্রামীণ মানুষের লোকসংস্কৃতি পরিবর্তনের মূল সুর ছিল শহর কেন্দ্রিক আগ্রাসী মনোভাবের। গ্রামবাসীর চেতনায় এই সত্যটি স্পষ্ট হয়েছে, বর্তমানে তারা বিভ্রান্ত এবং কিছুটা অসহায়ও।

মোট ৩৫৭৫ ব্যক্তিকে সমীক্ষা করা হয়েছে যার মধ্যে ২৯০০ (১৮.৮৯ %) জন পুরুষ এবং ৬৬৫ (১৮.৮৯%) জন মহিলা। উত্তরদাতাদের মধ্যে মোট ১৭১৭ (৪৮.০২%) জন লোকশিল্পী।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মোট ৭৯৭ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫৭৫ (৭২.১৪%) জন মনে করেন গ্রামীণ সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ কমে যাচ্ছে। বাঁকুড়ায় ৫৬০ জনের মধ্যে ৩৩৩ (৫৯.৪৬%) জন, জলপাইগুড়িতে ৭১৯ জনের মধ্যে ৫৩৯ (৭৪.৯৬%) জন, পুরুলিয়ায়

৭১১ জনের মধ্যে ৪৫৪ (৬৩.৮৩%) জন এবং বীরভূমে ৭৮৮ জনের মধ্যে ৭২০ (৯১.৩৭%) জন মনে করেন গ্রামীণ সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

"লোকসংস্কৃতিতে পরিবর্তনের পরিমান কত?" — এই প্রশ্নের জবাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ২৯৩ (৩৬.৭৬%) জন, বাঁকুড়ার ৮৭ (১৫.৫৩%) জন, জলপাইগুড়ির ২৯৯ (৪১.৫৮%) জন, পুরুলিয়ার ১৩০ (১৮.২৮%) জন এবং বীরভূমের ২৯৮ (৩৭.৮১%) জন জানিয়েছেন এই পরিবর্তন ব্যাপক। ঐ একই ক্রমান্বয়ে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার ২৭৮ (৩৯.০৯%) জন, বাঁকুড়ার ১৩৭ (২৪.৪৬%) জন, জলপাইগুড়ির ৪০৫ (৫৬.৩২%) জন, পুরুলিয়ার ২৭৮ (৩৯.০৯%) জন এবং বীরভূমের ১৯৮ (২৭.৮৪%) জন জানিয়েছেন লোকসাংস্কৃতিক কার্যকলাপে কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছে।

কোনো পরিবর্তনই হচ্ছে না — এমনটা মনে হয় দক্ষির ২৪ পরগণার ৭৮ (৯.৭৮%) জন, বাঁকুড়ায় ৭৬ (১৩.৫৭%) জন, জলপাইগুড়িতে ৭ (০.৯৭%) জন, পুরুলিয়ায় ৯২ (১২.৯৩%) জন এবং বীরভূমে ৫২ (৫.৮৫%) জন মানুষের।

লোকসংস্কৃতিতে পরিবর্তনের কারণ হিসাবে গ্রামবাসীরা যা জানান, তা এখানে তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো [৮] ঃ

কারণ	২৪ পরগণা (দঃ)	বাঁকুড়া	জলপাইগুড়ি	পুরুলিয়া	বীবভূম
আর্থিক অস্বচ্ছলতা	১৭০ (২১.৩২%)	১২২ (২১.৭৮%)	৬৮ (৯.৪৫%)	৮৮ (১২.৩৭%)	১৫২ (১৯.২৮%)
যন্ত্রমাধ্যমের প্রভাব	১৮৬ (২৩.৩৩%)	৭৪ (১৩.২১%)	২২৯ (৩১.৮৪%)	১৩ (১.৮২%)	২৬৪ (৩৩.৫০%)
আগ্রহের অভাব	১৫৪ (১৯.৩২%)	১১৫ (২০.৫৩%)	২২৬ (৩১.৪৩%)	—	৭৪ (১০.৪০%)
রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ	১৪ (১.৭৫%)	—	৩ (০.৪১%)	২৯ (৪.০৭%)	—
একতার অভাব	—	১০ (১.৭৮%)	—	—	১৩ (১.৬৪%)
আধুনিকতা	—	২৪ (৪.২৮%)	১ (০.১৫%)	৬০ (৭.০৩%)	১৫
সুযোগের অভাব	—	—	২৬ (৩.৯৪%)	—	(১৯.২৮%)
শিক্ষার অভাব	—	—	—	৮ (১.১২%)	৮ (১.০১%)
ধর্মগত হস্তক্ষেপ	২ (০.২৫%)	৪ (০.৫৫%)	—	—	—
জানিনা উত্তর নেই	৪৭+১১	১০৬	৫+২	১৬১	৮৬
	(৭.২৭%)	(১৮.৯২%)	(০.৯৭%)	(২২.৬৪%)	(১০.৯১%)

উপরোক্ত মূল্যায়ন Metafolklore গত উপাদানের ভিত্তিতে।

সবশেষে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে লোকসংস্কৃতি বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসাধারণের লোক-সংস্কৃতিগত ব্যাখ্যা বা মূল্যায়ন প্রচেষ্টা লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীর কাছে খুবই অপরিহার্য। লোকসংস্কৃতির আঙ্গিক 'লোক'দের (Folk) মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। যা অনুভব করতে হলে 'Text' 'Context', 'Texture' জানা প্রয়োজন। প্রয়োজন Metafolklore গত উপাদান। 'লোক'রা (Folk) তাদের সৃষ্টিকে কিভাবে ব্যবহার করে — সে বিষয় জানাও প্রয়োজন। ডান বেন- আমোস (Dan Ben-Amos) বলেছেন — " Metafolklore can be understood to mean the conception a culture has of its own folkloric communication as it is represented in the distinction of forms, the attributions of appropriateness of their application in various culture situations."[৭] কাজেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরালোকসংস্কৃতিগত (Metafolklore) উপাদান লোকসংস্কৃতির সার্বিক বিশ্লেষণে বিশেষভাবে সাহায্য করে। যার জন্যই পরালোকসংস্কৃতি বা Metafolklore কে বলা হয় — " folklore about folklore "

দ্রষ্টব্য :

১। "Metafolklore and Oral literary criticism" Dundes, Alan, The Monist, 1966.

২। 'Journal of American Folklore' 108 (1995) American Folklore Society, P-244.

৩। Essays In Folkloristics, 1978, P-40

৪। 'বিচিত্র দৃষ্টিতে ফোকলোর'; পৃ২৬

৫। Lyons J. Chomsky; Collins, London, 1970; P 42

৬। 'ফোকলোর: পরিচিতি ও পঠন - পাঠন'; ১৯৯৩, পৃ-২২১ .

৭। Folklore in Context Essays, Dan Ben-Amos, New Delhi, 1982, P-49.

৮। 'উজ্জীবন', সম্পা: সঞ্জীব সরকার, সি,সি,সি,এ, কলকাতা, ১৯৯৯।

অন্যান্য সহায়ক :

১। 'লোককলা : তত্ত্ব ও মতবাদ' ওয়াকিল আহমদ, সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক, ১৪০৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মানুষের জীবনে নিষেধাজ্ঞা ঃ Taboo
কারণ ও বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষিত

জীবন আকাঙ্ক্ষায় বাঁধা। যে আকাঙ্ক্ষার বলয়কে আবৃত করে রয়েছে মানুষের নানা 'মঙ্গল কামনা'। এই কামনাকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবনে সৃষ্টি হয়েছে নানা আচার নিয়ম কানুনের ধর্মীয় বিশ্বাসের বেড়াজাল। এসবকে 'রক্ষাকবচ' হিসেবে গ্রহণ করেছিল আদিম মানুষেরা। যার প্রসার ঘটেছে তাদের যাদুবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। প্রাচীন মানুষের সেই যাদুবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে জমাট বেঁধেছে 'টোটেম' 'ট্যাবু', 'মানা' ইত্যাদি। এগুলো সবই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে -- বিবর্তন করেছে। পশু, পাখি, ফুল, ফল প্রভৃতিকে সংস্কারের প্রেক্ষাপটে মানুষের বিভিন্ন গোষ্ঠী এক একটিকে তাদের আদি প্রবর্তক বলে মনে করে যা সেই গোষ্ঠীর টোটেম হিসেবে চিহ্নিত হয়। টোটেমকে উৎস ধরে ট্যাবুর বিকাশ। যার প্রচলিত অর্থ হল নিষেধাজ্ঞা। এবং মূল লক্ষ্য হল অস্ত্যর্থক ফলের আশায় নঞর্থক কর্ম। অর্থাৎ খুব সহজ কথায় বলা যায় - জীবন রক্ষাব জন্য কিছু নিয়ম- কানুন মেনে চলা। ফলে মানুষের জীবনে অনিবার্যভাবে নেমে এসেছে নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা।

'Taboo' শব্দটির উৎস সম্পর্কে একটু দেখা যাক্। এটি একটি পলিনেশীয় শব্দ। প্রাচীন রোমকদের মধ্যেও এর প্রচলন ছিল। রোমকদের 'Sacer' এবং পলিনেশীয়দের 'Taboo' -- এই দুই শব্দের অর্থ অভিন্ন। আবার গ্রীকদের '၃yac' শব্দ এবং ইহুদীদের 'Kodaush' শব্দ এবং পলিনেশীয় শব্দ 'Taboo' একই অর্থ বহন করে। এছাড়াও আমেরিকা, আফ্রিকা, উত্তর ও মধ্য এশিয়ার বহু জাতিও এই শব্দের দ্বারা অনুরূপ ভাব প্রকাশ করে থাকে। তবে বাংলা অনুবাদে যথেষ্ট সংশয় দেখা যায় ঐ শব্দের মূল ভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখতে। এ সম্পর্কে ধনপতি বাগ সিগমুন্ড ফ্রয়েডের 'টোটেম ও টাবু' গ্রন্থের ভাষান্তর করে জানিয়েছেন —

"আমাদের কাছে 'টাবু'র অর্থ দুইটি, এবং তারা বিপরীতধর্মী। এক পক্ষে ইহা পূত, পবিত্র এবং অপরদিকে ইহা অসোয়াস্তিকর, বিপজ্জনক, নিষিদ্ধ এবং অপবিত্র। পলিনেশিয়াতে টাবুর বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে 'Taboo' যার অর্থ হচ্ছে, যা কিছু সাধারণ এবং সহজলভ্য। অতএব 'টাবু' কথাটির মধ্যে সংরক্ষিত, নিষিদ্ধ এই ধরনের একটি ইঙ্গিত রয়েছে। 'টাবু' বলতে আসলে নিষিদ্ধ এবং আপত্তিজনক ভাবেরই প্রকাশ পাচ্ছে। 'পবিত্র-ভয়' এই যুগ্ম শব্দের দ্বারা অনেক সময় টাবু কথাটির ভাবার্থ প্রকাশ হয়ে থাকে।"[১]

সুতরাং 'টাবু' শব্দের মধ্যে নিষেধাজ্ঞার জোরই প্রবল। ফলে বাংলার ক্ষেত্রে 'Taboo'র প্রতিশব্দ হিসেবে 'নিষেধাজ্ঞা' ধরা যেতে পারে অনায়াসেই। প্রসঙ্গক্রমে

জানাতে হয় বিশ্বের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে 'Taboo'র ভাব প্রকাশে বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে 'খ্যানোত্', মরোক্কোয 'বাবাকা', নাগাল্যাণ্ডে 'গেন্না' জুলুদেব সমাজে 'হলোনিপা', বেচুয়াল্যাণ্ডে 'ইলা' ইত্যাদি। সব সংস্কৃতিতেই এইভাবে কোনও-না-কোন বিশেষ নামে চিহ্নিত হয়েছে। এবাবে খণ্ড চিত্র হিসেবে পূর্বে যারা 'Taboo' সম্পর্কে গভীব অনুসন্ধান মূলক কাজ করেছেন তাঁদেব মত উল্লেখ করা যাক।

প্রথমত: ভুণ্ড (Wundt) সাহেব ট্যাবুকে মানবতার সবচেয়ে পুরানো অলিখিত আইন বলে বর্ণনা করেছেন। ট্যাবু দেবতাদের চেয়েও পুরানো এবং প্রাক্-ধর্মযুগের বলে সাধাবণত ধবে নেওয়া হয়।

দ্বিতীযত: নৃতত্ত্ববিদ নর্থকোট ডব্লু, টমাস (North W. Thomas) জানিয়েছেন — 'ট্যাবু' বলতে কেবল মাত্র বোঝায় বস্তু বা ব্যক্তির পবিত্র বা অপবিত্র ভাব, এই পবিত্র বা অপবিত্র ভাব থেকে উদ্ভূত নিষেধাজ্ঞা এবং নিষেধাজ্ঞা অমান্য কবাব ফলে যে সব পবিত্রতার বা অপবিত্রতার সৃষ্টি হয় সেইগুলি। এছাড়াও তিনি ট্যাবুব শ্রেণী বিভাগ ও ব্যবহারেব উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন।

ট্যাবুর শ্রেণী বিভাগে দেখা যায —

১। স্বাভাবিক বা প্রত্যক্ষ, যেখানে 'mana' বা অদ্ভুত শক্তির ফল ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যেই নিবদ্ধ।

২। প্রচলিত বা অপ্রত্যক্ষ, এখানেও 'mana'ব শক্তি বর্তমান — তবে সে শক্তি হয় সংগৃহীত নয়ত দলপতি বা সর্দার বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক আরোপিত।

৩। মধ্যধর্মী, যেখানে উপরের দুটো থাকবে। যেমন, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বিশেষ ব্যবহার।

এবং ট্যাবু ব্যবহারের উদ্দেশ্য হিসাবে দেখান —

১। প্রত্যক্ষ ট্যাবুর উদ্দেশ্য হচ্ছে (ক) দলপতি, গুরু প্রভৃতি প্রখ্যাত ব্যক্তি ও বস্তুকে বিপদ থেকে রক্ষা করা; (খ) দুর্বলকে আশ্রয় দান — যেমন স্ত্রীলোক, শিশু এবং সাধারণ লোককে সর্দার বা গুরুদের জাদুকরী বিদ্যার প্রভাব থেকে রক্ষা করা। (গ) কতকগুলি বিপদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া — যেমন মৃতদেহ নাড়া চাড়া বা তার সংস্পর্শে আসা, কোন খাদ্য খাওয়া প্রভৃতি বিষয়জনিত বিপদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা; (ঘ) জন্ম, উপবীত (initiation), বিবাহ,

যৌনক্রিয়া প্রভৃতি জীবনের প্রধান প্রধান কাজকে বিপত্তি থেকে রক্ষা করা; (ঙ) দেবতা এবং প্রেতাত্মাদের ক্রোধের বিরুদ্ধে মানবকে অভয়দান করা; (চ) ভ্রূণস্থিত শিশু এবং ছোট ছেলেমেয়েদের সংরক্ষণ : বিশেষ করে যে সব ছেলে মেয়ে তাদের মাতাপিতার সঙ্গে খুব সহৃদয়তার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের কতকগুলি কাজের অবশ্যম্ভাবী ফল থেকে, বিশেষ করে খাদ্য বস্তু থেকে রক্ষা করা।

২। চোরের হাত থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, খেত-খামার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি রক্ষার জন্যও 'ট্যাবু' আরোপিত হয়ে থাকে।[২]

উপরের দুজনের মতামতে একথাই স্পষ্ট হয় যে, ট্যাবু বলতে সমস্ত লোক, লোকালয়, বস্তু এবং এদের সাময়িক অবস্থা, যা এই অদ্ভুত গুণটির উৎসস্থল ও বাহক হতে পারে - তাদের সকলকেই বোঝায় এবং এই আশ্চর্য গুণ থেকে উদ্ভূত নিষেধাবলিও ট্যাবু। তাছাড়া, আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী যা কিছু পবিত্র, অসাধারণ এবং একই সঙ্গে সাংঘাতিক অশুচি এবং অদ্ভুত — তা সবই ট্যাবু পর্যায়ভুক্ত।

'ট্যাবুর' উৎপত্তির সঠিক ধারণা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। 'ট্যাবু' পালনকারীদের জিজ্ঞাসা করলেও সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না। তবে মনে হয় একপুরুষ পরের পুরুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে যা বহুদিনের পুরানো সংস্কার বা আচার। বংশ পরম্পরায় এগুলো পালিত হয়ে এসেছে। পৈতৃক ও সামাজিক চাপে যে নিয়ম কেউ ভাঙতে সাহস পায়নি। আরও পরের দিকে সমষ্টিভূত হয়ে, বংশগত মানসিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে সঞ্জীবিত হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায় আদিম মানুষের সীমাবদ্ধ বিচার শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অসচেতন ভাবে যে সব বিশ্বাস সংস্কার গড়ে উঠেছিল প্রায় সহজভাবে, মূলত তারাই ছিল ট্যাবুর উৎস। বলাবাহুল্য যে কোনও নিষেধরীতিই কিন্তু Tabooর অন্তর্গত নয়। যে কাজ বা যে ব্যক্তি অথবা যে বস্তু কোনও-না-কোনও ভাবে কিছু একটা অলৌকিক শক্তির দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে আছে, তার সুবাদে যে নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত হয় — তাহ-ই ট্যাবু বলে গণ্য হয়। পূর্বের মত আবারও বলতে হয় কোন কিছুর প্রতি অতি পবিত্রতা এবং অপবিত্রতার ধারণা থেকেই টাবুর বিকাশ। টোটেমের মত ট্যাবুও ব্যক্তিগত ভাবে আবার সমগ্র সমাজের মান্য হিসেবেও থাকতে পারে।

'Taboo' র ব্যাপকতা মানুষের জীবনে সবর্ত্র। প্রসঙ্গ অনুসারে লোকসংস্কৃতিবিদ ড. পল্লব সেনগুপ্তের 'ট্যাবু' প্রসঙ্গে উল্লেখ্য কিছু কথা তুলে ধরা যায় —

" এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'অপরিচ্ছন্ন'। অর্থাৎ যা কিনা অপবিত্র, নোংরা,

অশুচি ইত্যাদি। অতএব সেই কারণেই নিষিদ্ধ। তবে উত্তরোত্তর এই শব্দটির ভাবগত পরিব্যাপ্তি ঘটেছে --- অতি পবিত্র, অতি শুচি ইত্যাদি বিষয়, বস্তু এবং ব্যক্তিও ট্যাবুর এলাকাভুক্ত হয়ে থাকে, উপলক্ষ বলে গণ্য প্রাণী বা ঘটনাও এর অন্তর্গত বলে ধরা হয়। সভ্যতার সমস্ত স্তরেই, দেশ-কালনির্বিশেষে এই বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যময় নিষেধবিধির সংস্কারগুলি প্রবহমান ছিল এবং আছে। সমস্ত সংস্কৃতি বলয়ের লোকপুরাণ বা মিথ, লোককথা, কিংবদন্তী প্রবাদ ইত্যাদির মধ্যেও বহু বিচিত্র ট্যাবুর হদিশ মেলে। বাংলা লোককাহিনীতেও ট্যাবুর প্রয়োগ খুবই ব্যাপক। পৃথিবীর বিভিন্নদেশের লোককথায় ট্যাবু ভাঙ্গার অপরাধে নিদারুণ বিপন্ন হবার বেশ কিছুসংখ্যক মোটিফ তথা কাহিনীরেণুকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন স্টিথ টমসন তাঁর 'মোটিফ ইনডেক্স অব ফোক লিটেরেচার' গ্রন্থমালার মধ্যে। সম্পূর্ণ একটি অধ্যায়ই (সি) তিনি এর জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছেন। এই থেকেই বোঝা যায় লোককথায় ট্যাবু-সংস্কারের বিশ্বজনীন অভিঘাতটি কতটা গভীর এবং ব্যাপক। এবং এটা লোকমানসে ট্যাবুর গুরুত্ব যে কতখানি, সেটিই সূচিত করে নিঃসন্দেহে।"[৩]

এর প্রমাণ হিসাবে বাংলা লোককথার ভাণ্ডার থেকে 'সুখ-দুখু'র কাহিনী অংশ তুলে ধরা যায় যেখানে 'Taboo' রয়েছে, যা অলৌকিক ঘটনা সম্পৃক্ত —

একজনের দুই বউ, দুজনেরই একটি করে মেয়ে। বড় বউয়ের মেয়ে দুখু, ছোট জনের মেয়ে সুখু। বড় বউ আর দুখুর চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসেন বাপ ছোট বউ আর সুখুকে। ওদের বাপ মারা গেলে দুখুদের মা-মেয়েকে তাড়িয়ে দেয়। একদিন দুখু উঠোনে বসে সুতো কাটছিল তখন বাতাসে তুলো উড়িয়ে নিয়ে চলল। যত পিছু পিছু দৌড়য়, দুখু তো নাগাল পায়না তুলোর। তা সে হাবুডুবু খাচ্ছে আর কাঁদছে। তখন বাতাস বলছে 'কাঁদে না দুখু, কাঁদে না। আয় আমার সঙ্গে, যত চাস, তত তুলো দেব তোকে।'

এরপর যাত্রাপথে দুখুর সঙ্গে একে একে গরু, কলাগাছ, ঘোড়ার সঙ্গে দেখা হয় এবং উপায় বলে দেয়। শেষপর্যন্ত দুখু এক চাঁদের মা বুড়ির কাছে পৌঁছয়। বুড়ির কাছে দুখু সব ঘটনা বলে। তখন চাঁদের মা বুড়ি বলছে, 'যদি বাধ্য মেয়ে হোস্, তুলোর চেয়ে অনেক ভালো সামগ্রী দেব। ওই পুকুরটা দেখছিস তো? ওতে দুটো ডুব দিয়ে নেয়ে আয়। তিনটে ডুব দিসনা বাছা।

দুখু তো পুকুরে গিয়ে একটা ডুব দিয়েছে। জল থেকে মাথা তুলছে তো দেখে রূপে আলো করছে এমন সুন্দরী হয়েছে ও। আবার ডুব দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গে আনারসী বেনারসী, সর্বাঙ্গে ঝলমলে সোনাহীরে মুক্তোর গয়না। গলার হারটা এমন ভারি, যেন ও মাথাই তুলতে পারে না। দুখু অবাক!

এই কাহিনীতে 'Taboo' হিসেবে দেখা যায় -- 'পুকুরে তিনটে ডুব না দেওয়া', যা অমান্য করার জন্য চরম শাস্তি পেয়েছে 'সুখু'। দেখা যাক্ 'সুখু'র কি ঘটেছিল --

... সুখু দৌড়ে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছে। এক ডুবে সে সুন্দরী। আবার ডুব দিয়েছে। দু'ডুবে সে গয়নায় ঝলমলে, পরণে বেনারসী।

তখন সুখু ভাবছে, 'দিই আরেকটা ডুব। দুখুর চেয়ে অনেক সুন্দরী হব, আরো নানাবিধ জিনিস পাব। সে তো বুড়ি চায়না। তাই আমাকে ডুব দিতে নিষেধ করেছে। কিন্তু আমি আরেকটা ডুব দেবই দেব'।

এই ভেবে সুখু আবার ডুব দিয়েছে। তখন কি হল? জল থেকে মাথা তুলে সুখু দেখে, হায় হায়! কোথা গেল ঝলমলে শাড়ি আর ঝকমকে গয়না? কোথায় গেল ঐ রূপ নাকটা হাতির শূঁড়ের মত লম্বা, সর্বাঙ্গে ফোস্কা, বড় বড় ফোড়া।

এইভাবে লোককথা, মিথ, কিংবদন্তী, প্রবাদে 'Taboo' দেখা যায় অজস্র, যা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে -- শুভ ফলের আশায়। ফলে ব্যাপকতা ঘটেছে 'Taboo' র মানুষের জীবনে। কাজেই সমাজের প্রবল নিষেধাজ্ঞামূলক নিয়মেরই নাম ট্যাবু। কোন বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট সদস্যদের জন্য যেমন এই নিয়ম ধার্য হতে পারে, তেমনি সার্বজনীনভাবে সমাজের সকলের উপরেও এর প্রয়োগ ঘটতে পারে। 'Taboo' র আচারগত বৈশিষ্ট্যের দিকে একটু নজর দিলেই দেখা যাবে যে বাধামূলক সব কাজের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে অতীন্দ্রিয় বা কোন রহস্যময় বিপদের আভাস। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পবিত্রীকৃত জীবনের সংসর্গের বাধার ইঙ্গিতও বেশ স্পষ্ট। সব সমাজের নিজস্ব কিছু 'Taboo' রয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রেও রয়েছে। পর্যায়ক্রমে তার কয়েকটি হল —

১. সোম ও বুধবার সঞ্চয়ে হাত দিতে নেই। এমনকি এই দু'দিন খাবার জন্যেও ঋণ করতে নেই —

'সোমে বুধে দিওনা হাত
ধার করে খেওনা ভাত।'

২. বাসি মুখে, বাসি কাপড়ে কাসুন্দি ছুঁতে নেই,
ছুঁলে নষ্ট হয়ে যায়।

৩. ফলন্ত গাছ কাটতে নেই। কাটলে পরিবারের
অকল্যাণ হয়।

৪. ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখতে নেই, দেখলে বদনামের
ভাগী হতে হয়।

৫. বালিশে বসতে নেই, বসলে পেছনে ফোঁড়া হয়।

৬. বাজাবার শাঁখ শুধু মেঝেয় রাখতে নেই।

কোন কিছুর ওপর রাখতে হয়।

৭. বাস্তু সাপ মারতে নেই।

৮. ঘুমন্ত শিশুকে আদর করতে নেই। করলে শিশুটি

ভীষণ জেদী হয়।

৯. শাঁখা ভেঙ্গে গেছে বলতে নেই, বলতে হয়

শাঁখা বেড়ে গেছে।

১০. কলা, বেল খাওয়ার পর কিছু না খেয়ে জল খেতে নেই।

১১. সন্তানবতী স্ত্রীলোকের বুকে খাদ্যদ্রব্য পড়লে তা

ঐ স্ত্রীলোকের খেতে নেই।

১২. গরম ভাত খেয়ে চুলে জল দিতে নেই।

১৩. এক প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপ জ্বালানো নিষেধ।

১৪. পুরুষের ঢেঁকি পাড় দিতে নেই, দিলে বিদ্যা হয় না।

১৫. বাড়ীর মধ্যে ডালিম গাছ লাগাতে নেই,

বিধবা হবার সম্ভাবনা থাকে।

১৬. গাছের ফলকে আঙুল দিয়ে দেখাতে নেই।

১৭. গর্ভবতী রমণীদের স্নান করতে নদীতে যেতে নেই।

ইত্যাদি।[৪] এছাড়াও অজস্র নিষেধাজ্ঞা মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এসবই আমাদের জীবনকেন্দ্রিক সংস্কারের আবর্তে গড়ে ওঠা।

এছাড়া আমাদের মধ্যে বৃত্তিগতভাবে জাতি বিভাগ রয়েছে, সেই সব গোষ্ঠীরও নিজস্ব কিছু কিছু 'Totem' র প্রচলন রয়েছে, যা তাদের 'Totem' অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। 'Totem' অনুসারে 'Taboo' র রূপ পাল্টে যায়। আবার এও বলা যায় 'Totem' কে কেন্দ্র করে কিছু কিছু 'Taboo' বিকাশ লাভ করে। এখানে কামারদের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি টোটেম সহ 'ট্যাবু'র উল্লেখ করা হল —

"পদবী"	"গোত্র"	"নিষেধাজ্ঞা"/টোটেম*
কর্মকার	গৌতম	গুঁতে মাছ খায়না
রাণা	কাশ্যপ	কচ্ছপ খায়না
কামিল্যা	শাণ্ডিল্য	শাল মাছ খায়না
বায়েন	চন্দ্র ঋষি	চন্দ্রকে নিজের বংশের আদি পুরুষ মানে*
শিকারী	শাণ্ডিল্য	শাল মাছ খায়না
কাইতি	সিন্দু ঋষি	সিঙ্গেল মাছ খাযনা
দে	মৌদগল্য	মৌচাক ভাঙ্গে না
দে	মৌজ ঋষি	ময়ূর মারে না

এরকম অজস্র 'Taboo' রয়েছে আমাদের জাতি বিভাগগুলোর মধ্যে, যার মধ্যে হয়ত সব সময় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা সঠিক কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে কিছু কিছু নিষেধাজ্ঞার মধ্যে 'কার্য-কারণ' সম্পর্কিত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ যে গুলোর বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করা সম্ভব। তবে তার আগে দেখে নেওয়া যাক্ কত রকমের 'টাবু' হতে পারে? চুলচেরা বিশ্লেষণে তা সংখ্যাতীত। যাই হোক সাধারণভাবে দশটি শ্রেণীতে বিভাজন হতে পারে 'Taboo' র। বলাবাহুল্য এই দশটি বর্গের প্রত্যেকটিই অজস্র উপবর্গ এবং 'অনুবর্গে' বিভাজিত হতে পারে।[৫]

১. খাদ্য-পানীয়-বেশভূষা ও ব্যবহার্য বস্তু সংক্রান্ত।

২. কথা বলা, শব্দ বিশেষ উচ্চারণ করা।

৩. জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ ইত্যাদি সংক্রান্ত।

৪. কোনও বিশেষ কাজ না করা সংক্রান্ত।

৫. কিছু ছুঁয়ে ফেলা সংক্রান্ত।

৬. দিনক্ষণ-তিথি ইত্যাদি সংক্রান্ত।

৭. কোনও কোনও বিশেষ কারুর হাজিরা-গরহাজিরা সংক্রান্ত।

৮. বিশেষ কিছু ভঙ্গী বা মুদ্রা করা-না-করা সংক্রান্ত।

৯ বিশেষ কিছু ভাবা কিংবা না ভাবা সংক্রান্ত।

১০ বিশেষ বিশেষ শাবীবিক অবস্থা সংক্রান্ত।

এ শ্রেণী বিভাজনেব উদাহবণ কিছু মিলবে পূর্বে উল্লিখিত নিয়েধাজ্ঞাওলোব মধ্যে। এবাব যে কথা বলাব অর্থাৎ 'Taboo' ব বৈজ্ঞানিক যুক্তিব কথায আসা যাক। এক্ষেত্রে আলোচনাব সুবিধার্থে শুধু মাত্র একটি বিযয অর্থাৎ গর্ভবতী বমণীদেব পালনীয সংস্কাবকেন্দ্রিক ট্যাবুব ক্ষেত্রটি দেখা যেতে পাবে।

গর্ভবতী নাবীদেব অজস্র পালনীয ট্যাবু বযেছে। বিশেষ বিশেষ খাদ্য গ্রহণে, বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তুব দর্শনে, এমন কি যাতাযাত ও প্রসাধনেব ব্যাপাবেও নানা নিযেধাজ্ঞা আবোপ কবা হযেছে। যাব মূল লক্ষ্য হল ভাবী সন্তানেব মঙ্গল বিধান কবা, যাতে তাব কোন ক্ষতিব সম্ভাবনা না থাকে। ভাবী জাতকেব ক্ষতি আবাব দু'ভাবে হতে পাবে বলে অনুমান কবা হযেছে — দৈহিক ও মানসিক। যখন বলা হয যে গ্রহণেব সময গর্ভবতী বমণী ফল-ফুলুবি কাটে তাহলে জাতক ঠোঁট, নাক কাটা অবস্থায জন্ম গ্রহণ কবে। এক্ষেত্রে জাতকেব দৈহিক ক্ষতিব সম্ভাবনাব প্রতিই বেশী গুরুত্ব দেওযা হয। কিন্তু আবাব যখন বলা হয অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায বেশি ঝাল খেলে জাতকেব বাগী হবাব সম্ভাবনা কিংবা গর্ভবতীব সাধ অপূর্ণ থাকলে জাতক লোভী হয তখন সেক্ষেত্রে ভাবী সন্তানেব মানসিক দিকটিই বেশী প্রাধান্য পায।

যেমন -- গর্ভবতী বমণীদেব নদীতে কাপড কাচা নিষেধ। যাব আপাত কাবণ হল তাব উপস্থিতিতে নদীব মাছ পালিযে যায আব তাতে ভাবী সন্তানেব অমঙ্গল হয। বা আটমাসে গর্ভবতী বমণীকে উঁচু জাযগায শযন কবতে নেই। এ'দুটি নিযেধাজ্ঞাব মূল কাবণ হল, গর্ভবতী বমণীদেব এই সমযে সাবধানে থাকতে হয, কাবণ পডে গেলে ভাবী সন্তানেব ক্ষতি হতে পাবে। প্রাসঙ্গিক ভাবে লোকসংস্কৃতিবিদ ড বকণ কুমাব চক্রবর্তীব এসম্বন্ধে অনুসন্ধান মূলক বক্তব্যও প্রণিধান যোগ্য —

"আধুনিক গবেষণায দেখা গেছে গর্ভবতী বমণীব শাবীবিক অসুস্থতাই কেবল তাব গর্ভস্থ সন্তানেব ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তাব কবে না, সেই সঙ্গে মানসিক প্রক্রিযাগুলিও গর্ভস্থ সন্তানেব ক্ষেত্রে ক্রিযাশীল। বিশেষত যুদ্ধোত্তব জার্মানীতে অসংখ্য বিকৃত দেহ ও মানসিক গঠন বিশিষ্ট শিশুব জন্ম এই ধাবণাব সৃষ্টি কবে। 'Dr. Stott'ও বিযযটি নিযে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করে মোটেব ওপব গর্ভিনী অবস্থায পালনীয সংস্কাবগুলিব তাৎপর্যেব প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধেই প্রসূতিব পালনীয আচবণ সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধবে যা বলে আসা হয়েছে সেগুলিকে নিছক অর্থহীন সংস্কার বলে উড়িয়ে দেওযাব পরিবর্তে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার কবে নেওযা হয়েছে। এখন এটা একটা স্বীকৃত সত্য যে

– not only physical illness of the mother but also the experience of Psychological stress can adversely affect the foetus, this may result in malformations or defects in the nervous system producing intellectual or behaviour disturbances (P-7 'The Psychology of superstition)"[৬]

এইভাবে বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত প্রচলিত ট্যাবুর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য অনুসন্ধান করা সম্ভব। ট্যাবু অনেকক্ষেত্রে আমাদের নিছক অর্থহীন মনে হতে পারে, তবে সব ক্ষেত্রে নয়। অনেক সময় ভয়-ভীতির সাহায্যেও সুফল লাভ করা যায়।

পরিশেষে, মানুষের জীবনের আবর্তনে 'ট্যাবু'র তাৎপর্য ও রূপ পরিবর্তন সাপেক্ষ। আদিম মানুষের মনে যে ধরনের তাৎপর্য বহন করত, বর্তমানে সেই তাৎপর্য অনেকক্ষেত্রেই বহন করেনা। বহন না করলেও একেবারে মুছে ফেলতেও পারেনা। কারণ ঐহিক কল্যাণ সকলেই চাই। আবার পূর্বপুরুষের ধারণাকেও সহজে অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া নেপথ্যে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিত রয়েছেই।

দ্রষ্টব্য ঃ—

১ 'সিগমুন্ড ফ্রয়েড 'টোটেম ও টাবু', ভাষান্তর ধনপতিবাগ, পৃঃ ১৭
২ পূর্বোক্ত দ্রষ্টব্য নং ১
৩ 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', ড পল্লব সেনগুপ্ত, পৃঃ ৬৮
৪ 'লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার', (৩য় সং) ড বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পৃঃ ৮৭ -১০২
৫ 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', ড পল্লব সেনগুপ্ত
৬ 'লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার', (৩য় সং) ড বরুণ কুমার চক্রবর্তী, পৃঃ ৪২

উৎস সূত্র ঃ—

১ "রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি" (২য় খণ্ড), মানিকলাল সিংহ, বাঁকুড়া, ১৯৮২
২. "বাঙালী জীবনের নৃতাত্ত্বিক রূপ", ড অতুল সুর, কলকাতা, ১৯৯২
৩. "লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার", (৩য় সং) ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, কলকাতা, ১৯৯৫
৪. "লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', ড. পল্লব সেনগুপ্ত, কলকাতা, ১৯৯৫
৫. "সিগমুণ্ড ফ্রয়েড টোটেম ও টাবু', ভাষান্তর ধনপতি বাগ, কলকাতা, ১৯৯৩
৬. 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', (২য় সং)সম্পা: ড বরুণ কুমার চক্রবর্তী, কলকাতা, ১৯৯৫।

দ্বিতীয় বলয়

লোকশিল্পকলা

- লোকায়ত শিল্পের ধারায় শঙ্খশিল্প।
- ইতিহাসের উপাদান হতে চলেছে — দশাবতারতাস।
- উৎসর্গ লোকায়তশিল্পের নিরিখে বাঁকুড়ার বেলমালা।
- পুরুলিয়ার মুখোশশিল্প।
- মাপার ঘরে সেরপাইশিল্প।
- ভারতীয় উপজাতির প্রেক্ষাপটে জলপাইগুড়ির মেচ রমণীদের বয়নশিল্প।
- লেপচা জনজাতির লোকশিল্প।

লোকায়ত শিল্পের ধারায় শঙ্খশিল্প

১. ।। শঙ্খধ্বনি ।।

'হেই সামালো, বর্গি আসছে' বলে গুঞ্জন উঠত একসময় বাংলার বুকে শঙ্খধ্বনি শুনে, তেভাগা আন্দোলনে। সেদিন গাঁয়ে গাঁয়ে কৃষক ঘরেব মা-বোনেরা হাতে হাতে শাঁখ তুলে নিয়ে দিনরাত্রি মাঠের ওপারের মেঠো রাস্তাটিব দিকে সতর্ক চোখ মেলে পাহাবা দিতেন। খেতের বুক পেরিয়ে লড়াকু গ্রামগুলোর দিকে পুলিশ আর মিলিটারিদের রুট-মার্চ শুরু হলেই তাঁরা শাঁখে ফুঁ দিয়ে কৃষক বিপ্লবীদেব সাবধান করে দিতেন। তখন তাই শুধু সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি নয়, সকালে দুপুরে বিকালে মাঝরাতে গাঁয়ের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত মাতিয়ে হঠাৎ হঠাৎ শোনা যেত শাঁখের আওয়াজ। তাই ধর্মীয় আব সামাজিক প্রথার শুভ শঙ্খধ্বনি আমাদের জীবনে সেদিন থেকে ধরা দিয়েছে এক নতুন ভূমিকায়। শুধু তাই নয়, শাঁখের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তেভাগা আন্দোলন একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

এত গেল এক বাস্তব প্রয়োজনের কথা। শুধু একালেই নয়, সুপ্রাচীন কাল থেকে শাঁখ ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। **শিব-দুর্গার কাহিনীতে, রাম-সীতার আখ্যানে, মহাভারতে, গীতার** উপাখ্যানে রয়েছে শাঁখের কথা। **ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, কালিকা পুরাণ** প্রভৃতি পুরাণে আছে শঙ্খের কথা—আছে শঙ্খধ্বনির কথা। শিবের জটায় **'গঙ্গা'** আটকে গেলে শঙ্খ বাজিয়ে **ভগীরথ** গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করেন। আবার কুরুক্ষেত্রে **পাঞ্চজন্য** শঙ্খ বাজিয়ে **কৃষ্ণ** যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। এছাড়া মহাভারতে নানা নামের শঙ্খের উল্লেখ রয়েছে--যুধিষ্টিরের **'অনন্তবিজয়'**, ভীমের **'পৌণ্ড্র'**, অর্জুনের **'দেবদত্ত'**, নকুলের **'সুঘোষ'** ও সহদেবের **'মণিপুষ্পক'**। আবার প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে (শুদ্ধভাষায়) শঙ্খকে **'কম্বু'** বলা হয়েছে—

"তিনকুল জিনি নাসা কম্বু সমগলে
কনক যূথিকামালা বাহুযুগলে।।"

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ বড়ুচণ্ডীদাস ঃ অথ তাম্বুল খণ্ড ।। আহের রাগ ।। পৃঃ-২০০)

একটু অন্যভাবে, বৈষ্ণবকবি জ্ঞানদাসের রূপানুরাগ পদে দেখি —

**"কম্ব-কণ্ঠে কনকমাল।
গজ মোতিম গাঁথি প্রবাল।।"**

(জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী ঃ শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার।। পদ ঃ ১০১ ।। পৃঃ-১২৫)

শঙ্খের নানা নামের মতো ব্যবহারেরও নানা তাৎপর্য রয়েছে। সুপ্রাচীন কালে যুদ্ধক্ষেত্রে শঙ্খ বিশেষ নির্দেশক হিসাবে যুদ্ধারম্ভ, যুদ্ধবিরতি, যুদ্ধসমাপ্তি ঘোষণায় কাজ করত। তবে, শঙ্খের সাবেকি ভূমিকাটাই এখনো পর্যন্ত আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে সবচেয়ে বেশী। মঙ্গলময় ও শুভঙ্কর ধ্বনি রূপে আচার উৎসব অনুষ্ঠানে শঙ্খধ্বনির রীতি আজও প্রচলিত।

বৈষ্ণবকবি জ্ঞানদাস তাঁর পদাবলীতে বন্দনা- অংশে **'শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা'** পর্যায়ে শঙ্খধ্বনির তাৎপর্যের অনুসূত্রে দেখি--

''ঘন ঘন গরজন ঘন ঘন বরিষণে।
দেবকী উদরে হইলা কৃষ্ণের জনম।।
হইল আকাশ পথে দুন্দুভির ধ্বনি।
শঙ্খবাদ্য করে যত দেবতা রমণী।।'

(ঐ)

শুধু তাই নয়, প্রাচীন বাংলার সঙ্গীত আসর গুলিতে 'শঙ্খতরঙ্গ' বাজান হত। সাত বা বারোস্বরের সাতটি বা বারটি শাঁখে আলাদা আলাদা স্বর ধ্বনিত করে রাগ বাজান হত। আবার ইউরোপীয়ান সংগীতজ্ঞরা শঙ্খকে 'Indian trumpet' বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে সাধারণভাবে শঙ্খকে বলা হয় শুষির শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র বা 'Airophonic Instrument'।

লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গেও শঙ্খধ্বনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রাকৃতিক ঘটনাকে শান্ত করতে মানুষ শাঁখে আওয়াজ তুলেছে। এখনো ভূকম্পনের সময় বহু মানুষকে শাঁখ বাজাতে দেখা যায়। শঙ্খ যেমন মঙ্গল ধ্বনি করে মঙ্গল কার্যে ব্যবহৃত হয় তেমনি সাপেদের সঙ্গম বা 'শঙ্খলাগা'তে শঙ্খধ্বনি করা এবং দেখা মঙ্গলসূচক বলে মানুষের বিশ্বাস।

শঙ্খধ্বনিকে মানুষ শুধু মঙ্গলসূচক হিসাবেই ব্যবহার করেনি, ব্যবহার করেছে ভয়ংকর মুহূর্তেও। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ থেকে কিছুকাল আগে পর্যন্তও **'সতীদাহ'** প্রথাতেও কিছু গোঁড়া মানুষ শঙ্খধ্বনিকে ব্যবহার করেছে। কত ভারতীয় রমণীকে, এই প্রথার অনুষঙ্গে শাঁখের আওয়াজের অন্তরালে 'সতী' হতে হয়েছে। এই ভয়ানক পরিস্থিতিকে বাংলাসাহিত্যের ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অসাধারণভাবে মূর্ত করেছেন তাঁর কাব্যে--

"গুড়িয়ে শাঁখা, সবাই মিলে
চিতায়ে মোরে বসিযে দিলে,
বাজল শতেক শাঁখ;
লোকের ভিড়ে ভরেছে ঘাট
ধোঁয়ায় চিতার আধ-ভিজাকাঠ,
উঠল গর্জে ঢাক।"

('বেণু ও বীণা' ঃ সহমরণ)

২. ।। শাঁখ, শাঁখারী ও শঙ্খশিল্প ।।

শাঁখকে ঘিরে যুগ যুগ ধরে বাঙালী শিল্পীরা একটি লোকশিল্পকলা গড়ে তুলেছেন। শাঁখের গায়ে তারা খোদাই করে চলেছেন পৌরাণিক, ঐতিহাসিক কিংবা সামাজিক চিত্র। আর শাঁখ কেটে সৃজন করে চলেছেন শঙ্খ বলয় থেকে শুরু করে রমণীদের অঙ্গসজ্জার গহনা পর্যন্ত। এমনকি বর্তমানে গৃহসজ্জার নানা সামগ্রীও সৃষ্টিলাভ করেছে তাঁদের হাতের সুচারুশিল্পী সুলভ সৃজনী শক্তিতে। এঁদের বলে শাঁখারী বা শঙ্খশিল্পী।

প্রাচীন কাল থেকে এই ধরনের লোকশিল্পীরা ছিলেন গ্রামের দেশের আর্থিক বুনিয়াদ গঠনে সচেতন-সচেষ্ট। এমনকি বর্তমান Globalization-এর যুগেও জনসমাজের আর্থিক কাঠামো গঠনে এঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু বর্তমানে তারা অধিকাংশই অনগ্রসর, অসহায় এবং অবহেলিত। দেশে কৃষিসভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, শিল্পায়ন হয়েছে কিন্তু এদের বিকাশ ঘটা তো দূরের কথা, বরং অবনমন ঘটেছে। তবু এরা কাজ করে চলেছেন বাঁচার তাগিদে--ঐতিহ্যের আমেজে। তাই লোকশিল্পকলা বা অন্যভাবে প্রাচীন কুটিরশিল্পগুলির প্রায়োজনিক বা ব্যবহারিক বা নান্দনিক বিশ্লেষণের পূর্বে এইসব লোকশিল্পকলার সঙ্গে নিবিড় সম্পৃক্ত শিল্পীদের জাতিবিভাগ, পদ-পদবী, গোত্র, টোটেম, ট্যাবু অন্যান্য সংস্কার ও সংশ্লিষ্ট প্রত্নতত্ত্বের পরিচয় জানা আবশ্যিক। সেই সঙ্গে সূত্রানুসন্ধান করতে হবে এদের উৎস ও জাতিগোষ্ঠী গুলির পারস্পরিক সম্পর্কের। তার আগে এক ঝলক দেখে নেওয়া ভাল প্রাচীন কাল থেকে বয়ে চলে আসা কুটিরশিল্পে জড়িত জাতিগোষ্ঠীগুলির সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটি। পরে তার অনুষঙ্গেই পর্যবেক্ষণ করব বা বিভাজন করা হবে শাঁখারী জাতিকে।

প্রাচীনকাল থেকে কয়েকদশক আগে পর্যন্তও ভারতবর্ষের গ্রামগুলি ছিল স্বয়ম্ভর। একটি গ্রামের বসবাসকারী মানুষদের চাহিদা, সেই গ্রামের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত জাতির

মানুষগুলোই মেটাত। এই চিত্র আজ ভারতবর্ষের গ্রামে-গঞ্জে বিলীন হয়ে গেছে। এর কারণ হিসেবে মনে হয় বেহিসেবি আধুনিক শিল্পায়ন ও 'Drain of wealth' অর্থাৎ দেশীয় সম্পদের বিদেশে নির্গমন। অবশ্য এছাড়া অন্যান্য কারণ থাকতে পারে। তবে যে কথা বলার তা হল বাঙালী জাতিগোষ্ঠীর বা সর্বভারতীয় জনগোষ্ঠীর জাতি-বিভাগগুলি ছিল মূলতঃ পেশা ভিত্তিক। যাকে অন্যভাবে বলা যেতে পারে 'Division of labour' অনুযায়ী।

সাহিত্য সমকালীন সমাজ-জীবনকে ধরে রাখে। অন্যদিকে কালের প্রবাহে বয়ে যাওয়া সমাজ-সংস্কৃতির ছাপ থেকে যায় প্রাচীন সভ্যতার নির্দশন গুলোতে। তাই 'Division of labour' বোঝাতে এসবেরই সাহায্য বা সহায়তা নিতে হয়, তাছাড়া লৌকিক কাহিনী-গান সর্বোপরি লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানত আছেই।

এই সূত্রে বৃহত্তর ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যপূর্ণ জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার একটি স্থানিক রূপ দেখা যায় মধ্যযুগের বাংলায়। এই সম্পর্কে আমরা ঋগ্বেদ-এর 'পুরুষসূক্ত' থেকে জানতে পারি--প্রজাপতির মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে রাজন্য বা ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পদদ্বয় থেকে সৃষ্টি লাভ করে শূদ্র। আবার 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' শূদ্র জাতির পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছে--শূদ্রজাতি উত্তম, মধ্যম ও অধম সংকর হিসেবে বিভক্ত। এই বিভাগের উত্তম সংকর পর্যায়ে 'শাঙ্খিক' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। তবে এপ্রসঙ্গে অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি' গ্রন্থের বক্তব্যও স্মরণীয় ".....শাঁখারী-সমাজের এক অংশের বিশ্বাস তাঁদের আদি পুরুষ বিশ্বকর্মা। শেষোক্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ঢাকার বিখ্যাত শাঁখারী সম্প্রদায় একদা মহা সমারোহে তাঁদের প্রধান উৎসব বিশ্বকর্মা পূজার অনুষ্ঠান করতেন।"

"ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ"-এর মতে—বিশ্বকর্মার ঔরসে গোপক কন্যাবেশী ঘৃতাচারীর গর্ভে যে নয় পুত্রের জন্ম হয় তাঁরা মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, কুর্ন্দিবক (তাঁতি), কুম্ভকার, কাংস্যকার, সূত্রধার, চিত্রকার ও স্বর্ণকার সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ।"

একইভাবে স্মরণীয় গোপীচাঁদের গান শীর্ষক গ্রন্থে শিবদুর্গা বিষয়ক—

"চণ্ডী বলে শুন গোঁসাই জটিয়া ভাঙ্গেড়া।
তোমার সঙ্গে আও করিলে লাগিবে ঝগড়া।।
চার ছেইলার মাও হৈলাম তোর দ্রব্যের ঘরে।
দয়া করি চারখান শাঁখা নাই পিন্ধাইস মোরে।।
ভাসুর আইসে শ্বশুর আইসে অন্ন আন্ধি দ্যাওতারে।

আমার হাত মড়া গোঁসাই তা লজ্জা লাগে তোরে।।

শিব বলে, শুন চণ্ডী, দক্ষ রাজার বেটি।

শাঁখা দিবার না পাইম আমি ডাক বাপের বাড়ি।।"

তাছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামেশ্বরের 'শিব সঙ্কীর্তন' বা 'শিবায়ন' (আনুমানিক রচনাকাল--১৭৩৫ খ্রি. থেকে ১৭৫০ খ্রি.) কাব্যে শঙ্খশিল্পের বিবরণ উদ্ভব ও শিব কর্তৃক দুর্গাকে শঙ্খ প্রদানের বিস্তৃত বিবরণ কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

শুধু কি প্রাচীন সাহিত্য লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যেও এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ছড়ার মধ্যে দুর্গার মুখ দিয়ে মূলত বাঙালী নারীর শঙ্খপ্রীতিই অভিব্যক্ত-

"আমার জাতের কথা শিব তুই কলু ভাঙ্গিয়া।

তোমার জাতের কথা কহলে লাগিবে ঝগড়া।।

ভাসুর আইসে শ্বশুর আইসে রণ-পরশুম তাকে।

হাতে শাঙ্কা নাই দ্যান গোঁসাই লজ্জা পাদু তাতে।।

শাঙ্কা কিনিয়া দ্যাও হে মদন মুরলী।

দশ হাতে দশ মুঠ শাঙ্কা কানে মদন কড়ি।।

শাঙ্কা না পাইলে তবে যাব বাপের বাড়ি।

বাপের বাড়ী যাব দুর্গা ভাইয়ের বাড়ী যাব।।

কাটনি কাটিয়া তবে দুই ছেইলকে পালিব।।"

এইভাবে প্রাচীন সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের নানা অংশে শাঁখারী জাতি ও শাঁখের উল্লেখ দেখানো যায়। তবে স্বল্প পরিসরে তা সামগ্রিকভাবে আলোচনা সম্ভব নয়। তবে রাঢ়বাংলার শাঁখারীদের সমীক্ষা থেকে জানা যায় — এরা প্রধানত চারটি থাক বা উপভাগ (Sub-caste)-এ বিভক্ত। সেগুলি হল—**পঙকা, রাজহাটী, শিখর্যা ও বর্ধমেনা**। এদের মধ্যে পঙ্ক থাকটি বৃত্তিগতভাবে গড়ে উঠেছে বাকি থাক্ বা উপবিভাগ আঞ্চলিক ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

রাঢ়বাংলা তথা অবিভক্ত বাংলার শাঁখারীদের মধ্যে প্রচলিত নানা পদ-পদবী, গোত্র এবং টোটেম-ট্যাবুর (Totem and Taboo) উল্লেখ বা প্রচলন দেখা যায়। সে সবের কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে---

পদবী	গোত্র	টোটেম
দত্ত	পরাশর	পলাশ গাছ কাটেনা এবং এই গাছের ফল ও পাতা ছেঁড়ে না।
নন্দী (ক)	মৌদগল্য	মৌচাক ভাঙ্গেনা।
নন্দী (খ)	ষান্ডিল্য	ষাঁড় বায় না, সাঞ্চা শাক খায় না।
ভদ্র	ভৃঙ্গ	ঋষিভ্রমর মারে না।
মণ্ডল	মৌদগল্য	মৌচাক ভাঙ্গেনা।
কুণ্ডু	মৌদগল্য	মৌচাক ভাঙ্গেনা।
নায়ক	মৌদগল্য	মৌচাক ভাঙ্গেনা।

পূর্বে শাঁখারীদের মধ্যে কেবলমাত্র অন্তঃবিবাহ প্রথাই (Endogamy) চালু ছিল, কিন্তু বর্তমানে শাঁখারীদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ (Exogamy) চালু হয়েছে। অনেক শাঁখারী তরুণ-তরুণীই আজ আর নিজেদের মাঝে বিয়ে প্রথা পছন্দ করছে না। ফলে, এভাবেও শাঁখারীদের পূর্ব পুরুষের দীর্ঘলালিত শঙ্খব্যবসা বিপন্নতার মুখে পতিত হচ্ছে।

শাঁখারী জাতির এই প্রেক্ষাপটে শঙ্খশিল্প উদ্ভবের কয়েকটি পৌরাণিক কিংবদন্তীর উল্লেখও প্রয়োজন। এই অনুষঙ্গেই ধরা পড়বে শঙ্খশিল্পের উদ্ভব ও বিকাশে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পটভূমিকা। তবে এ প্রসঙ্গে শঙ্খশিল্পের প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে মানিকলাল সিংহের 'রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি' (২ খণ্ড) গ্রন্থের নিম্নোক্ত বক্তব্যও উল্লেখ্য।

"হরপ্পা সভ্যতার সুপ্রাচীন ক্ষেত্রগুলি হইতেও শঙ্খশিল্পের নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। হরপ্পা, মহেঞ্জোদরো সভ্যতার যুগের পূর্বেও যে শঙ্খশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সভ্যতা পূর্বযুগ হইতে মৌর্যযুগ পর্যন্ত শঙ্খজাত শিল্প সামগ্রীগুলি যে আফগানিস্থান, ইরান, মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত উরু অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানি হইত তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।"

স্বাভাবিক ভাবে বলা যায় শঙ্খশিল্পের ইতিহাস অতিপ্রাচীন। নানা পৌরাণিক অনুষঙ্গ এবং ঐতিহাসিক উপাদান এ শিল্পের প্রাচীনতার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। দাক্ষিণাত্যের একাধিক স্থানে প্রায় দুহাজার বছর পূর্ব থেকেই শঙ্খশিল্পের প্রচলন ছিল বলে পণ্ডিতগণ ও গবেষকবৃন্দ অভিমত পেশ করেছেন। দাক্ষিণাত্য থেকে শঙ্খশিল্পের উদ্ভব ঘটে। সেখানে শঙ্খশিল্পীরা 'পাবওয়া' নামে অভিহিত হতো। দু হাজার বছর পূর্বের অনেক শঙ্খশিল্পের নিদর্শন তামিল দেশের প্রাচীন রাজধানী কোরকাই এবং কায়েলের ভগ্নস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত

হয়েছে। প্রাচীন যুগের তামিল সাহিত্য কর্মে শঙ্খশিল্পের উল্লেখ দেখে " The Chank Bangle Industry. Its Antiquity and Present Condition", Memoirs of Asiatic Society Journal (vol-3,P408)-এ জেমস হবলেন জানিয়েছেন— "Reference of ancient Tamil Classics furnishes evidence scanty but indubitable of the existence of an important chank – cutting industry in the ancient Pandyan Kingdom in the early centuries of the Christian era. Similar evidence is also extant of a widespread use of carved and ornamented chank bangles in former days by the women of the Pandyan country which may be considered as roughly coextensive with the modern districts of Tinnevelly, Madura and Pamnad, forming the eastern section of the extreme south of the Madras Presidency"

জেমস হবলেন লিখেছেন যে, দক্ষিণ ভাবতের মান্নার উপসাগবেব তীবে শঙ্খশিল্পের ব্যাপক প্রসাব ঘটে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয, তৃতীয শতকে। 'Maduraikkanchi' নামক একটি তামিল কবিতায পাণ্ডিযাণ (Pandyan) বাজ্যেব উপবাজধানী কোরকাই শহবে শঙ্খশিল্পের বিকাশ সম্পর্কে একটি চমৎকাব বিববণ পাওয়া যায। এবং সেই সময়ে গ্রীক এবং মিশরীয় বণিকদের মাধ্যমে কোরকাই শহবে উৎপন্ন শঙ্খশিল্প পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হতো।

সুতরাং শঙ্খশিল্পের প্রাচীনত্ব নিয়ে কোন সন্দেহই থাকে না যখন এ শিল্পকে নিয়ে গড়ে ওঠা পৌরাণিক কিংবদন্তী গুলোকে দেখি। তাব কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যে একটি কাহিনী এরকম—পুবাকালে শঙ্খচূড় অসুর নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত অসুরের আবির্ভাব ঘটে। এই অসুরের অত্যাচারে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল বারংবার নির্যাতিত হতে লাগল। স্বর্গের দেবগণ এই অমিত বিক্রমশালী অসুরকে কোনক্রমেই পরাস্ত করতে পারলেন না। শঙ্খচূড় অসুর জোরপূর্বক কৃষ্ণগত প্রাণা কুমারী তুলসী দেবীকে অপহরণ ও বিবাহ করেন। তুলসীদেবী ছিলেন পরম সতী সাধ্বী রমণী। তুলসীদেবীর সতীত্বের বলেই শঙ্খচূড় অপরাজেয় ছিলেন। যতদিন তুলসী দেবীর সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে ততদিন শঙ্খচূড়কে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের কোন বীরই জয় করতে পারবেন না। এই দৈববলের কথা দেবতারা জানতে পারলেন। অবশেষে ভগবান কৃষ্ণ ছলনাময় শঙ্খচূড় অসুরের ছদ্মবেশ ধারণ করে তুলসীদেবীর সতীত্ব নষ্ট করেন। দৈববলহীন অসুররাজ রণক্ষেত্রে দেবতাদের দ্বারা পরাজিত এবং নিহত হলেন। সতী তুলসী এই ছলনা অল্প কালের মধ্যেই জানতে পারলেন এবং তাঁকে অভিশাপ দিলেন—"নিষ্ঠুর দেবতা তুমি পাষাণ হইবে, তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিবে।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সতী তুলসীর অভিশাপ অবনত মস্তকে মেনে নেন। এবং বললেন-

-"আমি আমার পাপের জন্য শালগ্রাম শিলাতে পরিণতো হবো, আর সেই শালগ্রাম শিলারূপী নারায়ণের পূজা একমাত্র তুলসীপত্র দিয়েই হবে।" এবং আরো বললেন--"সতী তুলসী, আমি অন্যায়ভাবে বীর শঙ্খচূড়কে বধ করেছি। আমার বরে তোমার স্বামী শঙ্খচূড় শঙ্খনামে সমুদ্রগর্ভে জন্মগ্রহণ করবে। এই শঙ্খ আমার অন্যতম ভূষণ হবে, আর এই শঙ্খ হতে যে বলয় তৈরী হবে তাই-ই সতী-সাধ্বী নারীদের হাতে সতীত্বের প্রতীক হবে।"

এছাড়াও শঙ্খশিল্প উদ্ভবের অপর পৌরাণিক কাহিনীটিও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। একবার এক দেবসভায় এক বিশেষ আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে শিব-দুর্গাও আমন্ত্রিত হন। কিন্তু অনুষ্ঠানে যেতে দুর্গা পড়লেন মহাসঙ্কটে। স্বর্গলোকে সকল দেবীর দেহে যেখানে অলংকার শোভা পাবে সেখানে তিনি নিরাভরণ বেশে কেমন করে যাবেন ? বিব্রত শিব বিশ্বকর্মার সহায়তা কামনা করলেন। কিন্তু বিশ্বকর্মা শিবকে জানালেন যে বসুন্ধরার সকল রত্ন ইতঃ পূর্বেই আহৃত হয়েছে। একমাত্র সিন্ধুতলের শঙ্খই অবশিষ্ট আছে। এবং তা দিয়ে তিনি উৎকৃষ্ট অলংকার দুর্গার জন্য তৈরি করে দিতে পারেন। অগত্যা শিব তাতেই রাজি হলেন। দুর্গা যখন শঙ্খ-অলংকার পরে দেবসভায় গেলেন তখন শঙ্খের উজ্জ্বল শুভ্র আলোয় দেবীদের রাশি-বাশি উজ্জ্বল মাণিক্য ম্লান হয়ে গেল। সেই থেকে বিবাহিত হিন্দুনারীর শ্রেষ্ঠ অলংকার হলো দু'গাছি শুভ্র শঙ্খবলয়।

ঠিক এইরকম তাৎপর্যের বহু পৌরাণিক কিংবদন্তী শঙ্খশিল্পের উদ্ভবের স্বাক্ষর হিসেবে লোকায়ত সমাজে প্রচলিত রয়েছে। তবে উদ্ভবের স্থান ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য হলেও পরে বাংলার শঙ্খশিল্পের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় বর্তমানের ঢাকা শহরের শাঁখারী বাজার। আরো পরে তা দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া শহরে, হাটগ্রাম ও বিষ্ণুপুরে, নদীয়ার নবদ্বীপ, রানাঘাট, বালিয়াডাঙ্গা-শঙ্খনগর, বর্ধমান জেলার দশঘরা, চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বর, ২৪ পরগণার (উত্তর) বারাকপুর ও হাবড়া এবং কলকাতার বাগবাজার, জোড়াসাঁকো, শাঁখারী পাড়া লেন ও কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট অঞ্চলে ব্যাপকভাবে এখনও শাঁখারীদের বসবাস রয়েছে।

শঙ্খশিল্পের প্রধান উপকরণ হলো সমুদ্রের বিশেষ প্রজাতির এক প্রকার শঙ্খ। যা জীববিজ্ঞানের ভাষায় **Trifon Subicundus**। সাধারণত Taxonomic Status-এর দিকে থেকে তা Mollusca পর্যায়ের। বিশেষ প্রজাতির এই শঙ্খ শ্রীলঙ্কা ও মাদ্রাজ উপকূলে পাওয়া যায়। শ্রীলঙ্কার জাফনা এবং মাদ্রাজের তিতপুরই হলো শঙ্খের একমাত্র প্রাপ্তিস্থান। তবে সমুদ্রে বিভিন্ন আকারের ও প্রজাতির শঙ্খ পাওয়া যায়। শঙ্খবলয় ও শঙ্খের অলংকার তৈরীর জন্য বিশেষ কয়েকটি প্রজাতির শঙ্খ ব্যবহৃত হয়। এই প্রজাতিগুলো হলো—তিতপুটী, রামেশ্বরী, ধালা, ঝাঁজী, দেয়ানী, মতি-ছালামত, পাটী, পারবেশী, জাডাকি, তিতকৌড়ি, কেলাকার, জামাইপাটি, গড়বাকী, সুরতী, আলাবিলা শঙ্খ ইত্যাদি।

এছাড়া শঙ্খ শিল্পের জন্য যন্ত্রহিসেবে ব্যবহৃত হয়--'শাঁখের করাত' (বর্তমানে বিদ্যুৎ চালিত বিশেষ ধরনের মেশিন ব্যবহৃত হয়), তেপায়া টুল, হাতুড়ি, নরুণ, কুড়া, বিলুনি, ছেনি, উঘা (রেত বা ফাইল), একাধারা, উকো, পেন্সিল ইত্যাদি।

এই সব যন্ত্রপাতি দিয়ে শাঁখাবীরা নিজস্ব নির্মাণশৈলীতে নির্মাণ করে চলেছেন বাদ্যশঙ্খ, শঙ্খবলয়, বাউটি, নেকলেস, হেয়ার ক্লিপ, সিন্দূরদানি, ধূপদানি, কলমদানি এছাড়া নানা ধরনের অলংকরণের শৌখিন শিল্পসামগ্রী।

৩. ।। বিবাহঃ আচার-বিশ্বাস ও শাঁখ ।।

মানবজীবনের এক প্রান্তে জন্ম অন্যপ্রান্তে মৃত্যুর সমতলভূমি। মাঝখানে 'বিবাহ' নামক একটি পাহাড়ী টিলা। একদিকে রোমাঞ্চকর অনুভূতি অন্যদিকে নির্মম বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। এই দুই-এর সম্মিলিত ধারা মানুষকে বিবাহে আবদ্ধ করেছে। বিবাহ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক হৃদয়কে জীবনের একই মোহনাতে এনে হাজির করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের ঘটনাটি স্মৃতি হয়ে টিঁকে থাকে বিবাহের নানান লোকাচার এবং বিশ্বাসের স্মৃতিকে ভর করে। এই লোকাচার ও বিশ্বাসের অন্যান্য কিছুর মধ্যে অন্যতম অনুষঙ্গ হল শঙ্খ--শাঁখা।।

'বিবাহ' অনুষ্ঠানের নানা পর্যায়ে এর বিভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে। এরই একটি পর্যায় **'অধিবাস'**। বিবাহ অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে অধিবাস এর মধ্য দিয়ে। বিবাহের নির্দিষ্ট দিনের একদিন কিংবা দু'তিন দিন আগেও এর সূচনা হয়ে থাকে। যার সাক্ষ্য বহন করে চলেছেন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কবিরা--

বিজয়গুপ্ত ঃ ''কল্য বিবাহ পদ্মার অদ্য অধিবাস।''

(পদ্মাপুরাণ, প্রাগুক্ত পৃঃ- ৭৪)

বংশীদাস ঃ ''কালি অধিবাস পরশু হৈব বিয়া।''

(পদ্মাপুরাণ, প্রাগুক্ত পৃঃ- ৭৫)

অধিবাস শুধুমাত্র বিবাহেরই অঙ্গ নয়। হিন্দুর অন্যান্য অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে অধিবাসের মধ্য দিয়ে। দুর্গাপূজা প্রভৃতি দেবতার কাজেও অধিবাসের প্রচলন রয়েছে। অধিবাস উপলক্ষ্যে 'বরণডালা' সাজানো হয়। সেই ডালাতে রাখা হয়--ধান, দুর্বা, মহী, চন্দন, হরিদ্রা, শঙ্খ ইত্যাদি যা প্রাচীন বাংলা কাব্যের কবিরা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন-

মুকুন্দরাম ঃ ''মহীগন্ধশিলা দূর্ব্বাপুষ্পমালা

ধান্য ঘৃত ফল দধি।

স্বস্তিক সিন্দূর কজ্জল কর্পূব

চামর শঙ্খ যথাবিধি।।"

(কবিকঙ্কণ চণ্ডী, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৯১)

সৈয়দ আলাওল ঃ "মহীগন্ধ শিলা ধানদূর্ব্বা পুষ্পফল।

দধি ঘৃত শঙ্খ আর সিন্দূর কাজল।।"

(পদ্মাবতী, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২১৬)

রূপরাম ঃ আনিল গঙ্গশিলা স্বস্তিক পুষ্পমালা

কঙ্কণ শঙ্খ ফল দধি।

যাবক গোরোচনা ধান্যরূপা সোনা

হরিদ্রা দিল যথাবিধি।।"

(ধর্ম্মমঙ্গল, প্রাগুক্ত পৃঃ- ৬০)

শুধু শঙ্খই নয়, রয়েছে 'কড়ি'র কথাও—

"সুরঙ্গ পাটের শাড়ী পরিতে হীরার কড়ি

বিদমালা সুবর্ণ জড়িত।।

চিনি চাঁপা বর্তমান সরস গুবাকপান

হরিদ্রারঞ্জিত সুবসন।

গোরোচনা নিল শঙ্খ চামর চন্দন পঙ্ক

পুষ্পমালা কজ্জল দর্পণ।।"

(শ্রীকৃষ্ণবিজয় ঃ মুকুন্দরাম, পৃ- ২৬৩)

অন্যদিকে বিবাহিত হিন্দু রমণীদের কাছে 'শাঁখা' বা শঙ্খবলয় 'সতীত্বের' প্রতীক হিসেবে আজও তাৎপর্যময়। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এগুলো পরিত্যাগ করতে হয়। বাঙ্গালী নারী সমাজে 'শাঁখা'র মর্যাদা তাদের স্বামীর মর্যাদার প্রতীক, যার প্রমাণ মেলে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কবিদের গাথায়—

তন্ত্রবিভূতি ঃ "শঙ্খ সিন্দুর গেলে কন্যা জলে দিয়া ডুব।

ইহার স্বামীর হবে সর্ব্বত্রেও শুভ।।"

(মনসাপুরাণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ-২৫৯)

নারায়ণদেব ঃ "শতেক বৎসর জিয় সাত জাতির মাও হইয়
সিন্দূর পরিয় পাকা কেশে
তাহার স্বামী মৈল সে শোকে পাগল হল
হাতে শঙ্খ ফেলাইল ভাঙ্গিয়া।"

(পদ্মপুরাণ, পৃঃ- ৫৬)

বিজয়গুপ্ত ঃ 'বানিয়া কুলের রাঁড়ি শঙ্খ সিন্দূর নহে পরি।'

(পদ্মপুরাণ, পৃঃ- ৫২৪)

রামেশ্বর ঃ "বাপের বাড়ীতে শঙ্খ বিলক্ষণ পর্য্যা।
আসিব তোমার ঘরে আন যদি ফির্য্যা।।"

(শিবকীর্তন গলা, পৃঃ-২৯৬)

শঙ্খশিল্প বর্তমান আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে খুবই সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে। একদিকে রয়েছে পর্যাপ্ত কাঁচামালের অভাব এবং অন্যদিকে Market-economy-র প্রভাব। কাঁচামালের অভাবে দেখা যাচ্ছে অনেক শঙ্খশিল্পীই একই যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ কৌশলে বা শৈলীতে শাঁখের বদলে নারকেল মালা, বেলখোলা প্রভৃতির উপর খোদাই করছেন। ঘটে যাচ্ছে শিল্পীদের মধ্যে বৃত্তির পরিবর্তন অর্থাৎ transfer of trends। এই পরিবর্তনের কারণ হিসাবে বর্তমানের বাজারদরকেও সনাক্ত করা যায়। এককথায় শঙ্খশিল্পের বিপণনব্যবস্থা খুবই করুণ। ঠিক এরই পাশাপাশি শঙ্খশিল্পের দৈন্যতার লক্ষণ হিসেবে দেখা যায়—যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক ঐতিহ্যে এই শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল, তা বর্তমানে অবনমিত হয়েছে বা শৈথিল্য দেখা নিয়েছে। অনেক সধবা হিন্দুনারীই শঙ্খপরিধানকে এখন আর অনিবার্য বলে মনে করে না। সুতরাং আমরা লোকায়ত শিল্পধারায় একটি শৈলীকে ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে যেতে দেখছি। যদি লোকায়ত শিল্পকলা এক একটি দেশের লোকসংস্কৃতি তথা জাতীয় সংস্কৃতির মূল্যবান উপাদান হয়—সেই দিক থেকে কি আমরা লোকশিল্পের সঙ্গে জড়িত জাতিতত্ত্বের (Ethnography) একটি দলকে ক্রমশ হারাচ্ছিনা!!

উৎস সূত্র ঃ—

১. পশ্চিমবঙ্গ ঃ তেভাগা সংখ্যা ঃ১৪০৪।

২. ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণ।

৩. মহাভারত।

৪. শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ঃ বড়ু চণ্ডীদাস।

৫. জ্ঞানদাস ও তাহার পদাবলী।

৬. বেণু ও বাণী ঃ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

৭. বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ ঃ (সম্পাঃ) ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী।

৮. মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্য ঃ সনৎকুমার নস্কর।

৯. বঙ্গলক্ষ্মীব ঝাঁপি ঃ অমিযকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০. রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি ঃ মানিকলাল সিংহ।

১১. প্রাচীন বাংলা লোকসাহিত্য লোকাচার ও লোকবিশ্বাস ঃ মৃত্যুঞ্জয় গুঁই।

ক্ষেত্রসমীক্ষা ঃ ১। বাঁকুড়া জেলা : বাঁকুড়া সদর, বিষ্ণুপুর, হাটগ্রাম।

২। নদীয়া জেলা : শঙ্খনগর বালিয়াডাঙ্গা

৩। মুর্শিদাবাদ জেলা : জিৎপুর

৪। উত্তর ও দ: চব্বিশ পরগণা।

তথ্যদাতা ঃ শক্তিপদ লায়েক

গোপাল নন্দী

বিশ্বজিৎ নন্দী

বংশীধর মণ্ডল

বাবলু নন্দী

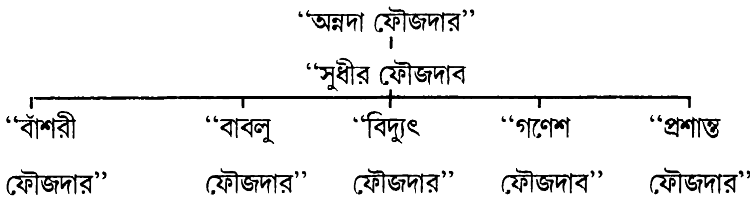
ইতিহাসের উপাদান হতে চলেছে –
দশাবতার তাস

মল্লভূমের বিষ্ণপুরের অসাধারণ স্থাপত্যের পাশাপাশি আরেক অতুলনীয় শিল্পকীর্তি - দশাবতার তাস ও নক্সাতাস, যা বর্তমানে সহায়তার অভাবে ইতিহাসের উপাদান হতে চলেছে। অথচ একদিন মল্লরাজ বীর হাম্বির, তার শিল্পী সুলভ আনুগত্যে স্থানীয় 'ফৌজদার পরিবারকে' নিয়ে বাঁকুড়া জেলার বুকে আত্মপ্রকাশ করিয়েছিলেন 'দশাবতারের'। প্রকাশ পেয়েছিল লোকশিল্পকলার আর এক অনন্য উপাদান।

মল্লরাজারা কোন এক সময়ে এই ফৌজদার পরিবারকে বিষ্ণুপুরে নিয়ে এসেছিলেন। 'ফৌজদার' রাজার দেওয়া উপাধি। একসময় এই গোষ্ঠীর মানুষেরা রাজার হয়ে যুদ্ধ করতেন। কিন্তু কেন তারা যুদ্ধের হাতিয়ার ছেড়ে তুলি ধরলেন? এই নিয়ে অবশ্য নানা গল্প প্রচলিত রয়েছে তাদের মধ্যে। তবে এ ব্যাপারে ফৌজদার পরিবারের বিদ্যুৎ ফৌজদার জানিয়েছেন -- ষোল শতকের দিকে মল্লরাজ বীরহাম্বির কোথাও দেখেছিলেন এই তাস এবং যার অনুকরণে তাদের পূর্বপুরুষ কার্তিক ফৌজদার অস্ত্র ছেড়ে তাস আঁকা শুরু করেন। সেই সুচনা থেকে বর্তমানেও বিষ্ণুপুরের শাঁখারী বাজার মহল্লায় ফৌজদার বংশ হতাশার সঙ্গে পুরুষানুক্রমের ঐতিহ্যে সৃজন করে চলেছেন দশাবতার তাস ও নকসা তাস। এই ধারণার সমর্থন মেলে দশাবতার তাসের খেলোয়াড় চঞ্চল কর্মকার ও অজিত কর্মকারের (বর্তমান) বক্তব্যেও : "বিষ্ণুপুরের দশ অবতার তাস প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের প্রাচীন। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের সমৃদ্ধিকালে এই দশ অবতার তাস খেলার প্রবর্তন হয়েছিল মল্লভূমে। মোটামুটি শোনা যায়, এই দশ অবতার তাস সম্রাট আকবরের রাজসভায়ও খেলা হত। বিষ্ণুপুরের রাজা মল্লরাজা বীরহাম্বীর এই খেলা উড়িষ্যা থেকে বিষ্ণুপুর রাজদরবারে নিয়ে আসেন। বিষ্ণুপুরের দশ অবতার তাসের "নবম" অবতার বুদ্ধের পরিবর্তে "জগন্নাথ" অবতারকে গ্রহণ করা হয়েছে, এর কারণ পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির বারো শতকের মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই কারণে খেলার জন্যে উড়িষ্যার মহারাজা বুদ্ধ অবতারের পরিবর্তে জগন্নাথদেবের মূর্তি অঙ্কিত করান। এই থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর উড়িষ্যা থেকে এই খেলা বিষ্ণুপুর রাজদরবারে প্রতিষ্ঠিত করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, বিষ্ণুপুরের রাজা আকবরের রাজসভায় এই তাস খেলা দেখে দিল্লীর দরবার থেকে বিষ্ণুপুর রাজদরবারে নিয়ে আসেন। যাইহোক রাজা বীরহাম্বীর ঐ তাসের অনুকরণে শিল্পী কার্তিক ফৌজদারকে তাস আঁকতে বলেন।এই কার্তিক ফৌজদারের আমল থেকেই বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পরিবার দশ অবতার তাস তৈরী করার

চর্চা আজও বজায় রাখতে পেরেছেন। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা যে পদ্ধতিতে দশ অবতার তাস খেলতেন সেই পদ্ধতি অনুযায়ী পরবর্তীকালে রাজা ˇকালীপদ সিংহঠাকুর যে সকল খেলোয়াড়কে নিয়ে খেলতেন তাঁদের মধ্যে প্রযাত কয়েকজন খেলোয়াড়ের নাম দেওয়া হল — নিরঞ্জন কুণ্ডু, ভজহরি দে, জটাধারী চক্রবর্ত্তী, বাদল দাস (ছোট ভাই), গুইরাম গিরি, কিশোরীমোহন দাশগুপ্ত, সতীশ ঘোষ প্রভৃতি।"

দশাবতার তাস ও নকসা তাস এঁকে কিংবদন্তী হয়েছেন সুধীর ফৌজদাব, যাকে 'Sunday Mail' পত্রিকা বলেছিল -- "Faujdar is Perhaps the role living artist who makes the famous 'dasavatar' and the naksha playing cards of Bishnupur" সত্যিই তাই। সুধীর ফৌজদাবেব সেই অকৃত্রিম ধারা ক্ষীণভাবে বয়ে চলেছে তাঁর সন্তানদের মাধ্যমে। বর্তমান দশাবতার ও নকশা তাসের শিল্পীদের একটি সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয় তুলে ধরা যেতে পারে —



সুধীর ফৌজদারের এই পাঁচ পুত্রই বর্তমানে দশাবতার তাস ও নকশাতাসের ভবিষ্যৎ দিশারী। তবে এঁদের পরে এইসব তাস নিজেদের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ রয়েছে।

□ যোগাযোগের সূত্র :

কলকাতার ধর্মতলা থেকে সড়ক পথে ১৫১ কি. মি. দূরে প্রাচীন বাংলার প্রাচীন শহর বিষ্ণুপুরের অবস্থান। যারই একটি পাড়া শাঁখারী বাজার, যেখানে ফৌজদার পরিবারের বাস। আবার রেলপথে বিষ্ণুপুরের দূরত্ব ২০১ কিলোমিটার। যেখানে ট্রেনে কয়েকঘন্টার ব্যবধানে সহজেই পৌছে যাওয়া যায় হাওড়া থেকে পুরুলিয়া এক্সপ্রেস ও চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে।

দশাবতার তাসের শিল্পীদের সামান্য পরিচয় ও বিষ্ণুপুরের শাঁখারী বাজার অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের উল্লেখের পর এবারে প্রবেশ করবো এ শিল্পের বিষয়, উপাদান, সরঞ্জাম, কর্মপদ্ধতি, খেলার সূত্র, মূলধন ও বিপণন ব্যবস্থা এবং বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে দশাবতার শিল্পীদের অবস্থানের আলোচনায়।

মূলবিষয় ঃ দশাবতার তাসের মূল বিষয় হল পুরাণের কাহিনী। অর্থাৎ পুরাণের নায়কদের কেন্দ্র করেই দশাবতার তাসের কলা কৌশল। সাধারণত সাড়ে চার ইঞ্চি ও তিন

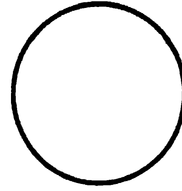
ইঞ্চি ব্যাসের এই তাসের ওপর আঁকা থাকে বিষ্ণুর দশ অবতারের ছবি। যাঁরা হলেন 'বরাহ', 'জগন্নাথ' (বুদ্ধ), 'কূর্ম; 'মৎস্য', 'নৃসিংহ', 'বামন', 'রাম', 'পরশুরাম', 'বলরাম', ও 'কল্কি'। রাজা নামে প্রতিটি অবতারের সঙ্গে থাকে এক 'উজির'। রাজা থাকেন দেউল বা রথে। সঙ্গে থাকে তার সহচর। রাজা ও উজির ছাড়াও প্রতিটি অবতারের সেটে থাকে, সেই অবতারের ক্রমপর্যায় সংখ্যা অনুসারে প্রতীক সম্বলিত আরো দশটি তাস। তাহলে দশাবতার তাসের মোট তাসের সংখ্যা হলো ১২০ টি। এছাড়াও এই শিল্পীরা বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত ৪৮ টি তাসের 'নক্সাতাস'ও অসাধারণভাবে সৃজন করেন। আবার ঘরসাজাবার অনুসূত্রে শিল্পীরা তৈরী করে থাকেন দশাবতার তাসের অনুকরণে ১০-১২ ইঞ্চি ব্যাসের ওয়াল - হ্যাঙ্গিং।

অবতারের নাম	প্রতীক	রাজার সংখ্যা	উজিরের সংখ্যা	অন্যান্য তাসের সংখ্যা	মোট তাস
বরাহ	শঙ্খ	১টি	১টি	১০টি	১২টি
জগন্নাথ	পদ্ম	১টি	১টি	১০টি	১২টি
কূর্ম	কচ্ছপ	১টি	১টি	১০টি	১২টি
মৎস্য	মাছ	১টি	১টি	১০টি	১২টি
নৃসিংহ	চক্র	১টি	১টি	১০টি	১২টি
বামন	কুমন্ডল	১টি	১টি	১০টি	১২টি
রাম	তীর	১টি	১টি	১০টি	১২টি
পরশুরাম	কুঠার	১টি	১টি	১০টি	১২টি
কল্কি	তলোয়ার	১টি	১টি	১০টি	১২টি
বলরাম	গদা/লাঙল	১টি	১টি	১০টি	১২টি
১০ টি অবতার	১০টিপ্রতীক	১০ টি	১০ টি	১০০ টি	১২০ টি

☐ উপকরণ ও সরঞ্জাম:

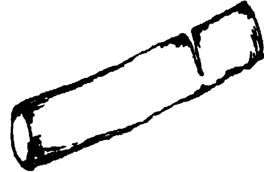
দশাবতার তাস ও নক্সাতাস প্রস্তুতের জন্য যে সব উপকরণ লাগে তা খুবই সাধারণ। এসব হাতবাড়ালে সহজেই নাগালে পাওয়া যায়। যার মধ্যে পড়ে 'পুরানো কাপড়', 'তেঁতুল বিচির আঠা,' 'সাবু', বার্নিশ (গালা ও স্প্রীট্ এর মিশ্রণ), 'খড়িমাটি', গিরিমাটি ও বিভিন্ন ধরনের জল রং দশাবতার শিল্পীরা ব্যবহার করেন। আর সরঞ্জাম হিসাবে ছোট-খাটো যন্ত্রপাতিই ব্যবহার করেন শিল্পীরা। পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত সরঞ্জামের নাম -কাজ -উপাদান (নির্মিত) চিত্র সহকারে দেখানো হল —

"ধাঁচা" ঃ



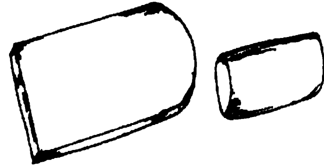
লোহার পাতের পাতলা চাকতি। যা দিয়ে মাপ করে গোল গোল করে কাপড়ের শক্ত 'পট'কে তাসের অনুরূপে কাটা হয়।

"খাড়ি" ঃ



পেযারা গাছের সরু ডাল কেটে তৈরী; যার এক দিকে খাঁজ কাটা থাকে। এটা দিয়ে তাসের চারিদিকের ধার বাঁধা হয় ঘষে ঘষে।

"শিল-নোড়া" ঃ



পাথর দিয়ে তৈরী। দুটি অংশ থাকে - একটি ছোট পাটাতন এবং আর একটি ছোট গোলাকার অংশ। এর সাহায্যে তাসের দুই পিঠ ঘষে মসৃণ করা হয়, যার পারিভাষিক নাম ' মিশেলকরা'।

এসব ছাড়া বিভিন্ন ধরনের তুলি ও 'কাঁইচি' ব্যবহৃত হয়। এর সঙ্গে মাঝে মাঝে রুলপেন্সিল ব্যবহার করেন প্রয়োজন মতো, দশাবতার ও নক্সাতাস শিল্পীরা।

নিমার্ণপ্রণালী ঃ

দশাবতার তাসের নির্মাণ-প্রণালী খুবই জটিল। তবে এই নির্মাণ প্রণালীতে দুটি পর্যায় রয়েছে।

প্রথমপর্যায় : এ পর্যায়ে প্রথমে অনেক গুলো পুরানো কাপড়ের অংশ তেঁতুল বিচির আঠা দিয়ে পর পর লাগানো হয়। অর্থাৎ একটি উপর আর একটি কাপড় আঠা দিয়ে সংযুক্ত করা হয়, এরপর তিনভাগ তেঁতুল বিচির আঠা ও ১ ভাগ খড়িমাটি মিশিয়ে প্রস্তুত লেই ঐ কাপড়ের দুই দিকেই ছয় থেকে আটবার প্রলেপ দেওয়া হয়। প্রলেপ দেওয়ার পর বস্তুটি সূর্যালোকে শুকোতে হয়। এই সময়ে প্রচুর সূর্যের আলো বা তাপ প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখতে হয়, যাতে কাপড়ের নরমভাব না থাকে অর্থাৎ কাপড়ের অংশগুলিকে একটি শক্ত কাডবোর্ডের মতো করে তুলতে হবে। এই কার্ডবোর্ডের মতো অংশটিকে 'ধাঁচা' দিয়ে মাপ করে কাঁইচির সাহায্যে গোল গোল অংশে তাসের জন্য কাটা হয়। তারপর ঐ গোলাকার অংশের ধার বাঁধা হয় খড়ি দিয়ে। যার Metalanguage অনুসারে নাম 'ধারবাঁধা'।

ধারবাঁধার গোল বোর্ডগুলির দুই পিটকেই পাথরের শিল-নোড়ার সাহায্যে ঘষে মসৃণ করা হয়। এই কর্মপ্রচেষ্টার নাম 'মিশেল করা'। মিশেল করার পর তৈরী হয় চিত্রহীন দশাবতার তাস। অর্থাৎ অবতার আঁকবার আধার।

দ্বিতীয় পর্যায় : এ পর্যায়ে রং করার পালা। সাধারণত দশ রকমের রং ব্যবহৃত হয়। তবে রং ব্যবহার করার আগে পেনসিল দিয়ে হাল্কা করে শিল্পীরা যা আঁকতে চান, তা এঁকে নেন। প্রথমে আলাদা আলাদা দশটি কার্ডে দশ রকমের রং ব্যবহার করেন আলাদা আলাদা ভাবে। তারপর এক একটি কার্ডে 'বাসন্তী' রং দিয়ে রাঙানো শুরু করেন। তারপরে পর্যায়ক্রমে শিল্পীরা দশধরনের রং ব্যবহার করে সৃজন করেন দশাবতার তাস, যা ছকের সাহায্যে পরের দিকে দেখানো যাবে। তবে রং এর ক্ষেত্রে একটি রং না শুকোলে অন্য রং করা অসম্ভব। সবশেষে তাসের ওপর ভালোভাবে বার্নিশ দিয়ে পালিশ করা হয়। শেষ হয় দশাবতার তাসের নির্মাণ প্রণালী। এ ব্যাপারটিকে সামগ্রিকভাবে এক ঝলকে দেখা যেতে পারে —

প্রথম পর্যায় ঃ

পুরানো কাপড়ের বিভিন্ন অংশে একের পর এক তেঁতুলবিচির আঠা দিয়ে লাগানো।।

তিনভাগ আঠা ও একভাগ খড়িমাটি মিশিয়ে প্রস্তুত লেই দিয়ে কাপড়ের নরম অংশে ৬-৮ বার প্রলেপ।।

কাপড়ের নরম অংশকে সূর্যালোকে শুকিয়ে শক্ত কার্ডবোর্ডের মতো করা।।

'ধাঁচা' দিয়ে কাপড়ের শক্ত বোর্ডকে কাঁইচির সাহায্যে গোল গোল কাটা।।

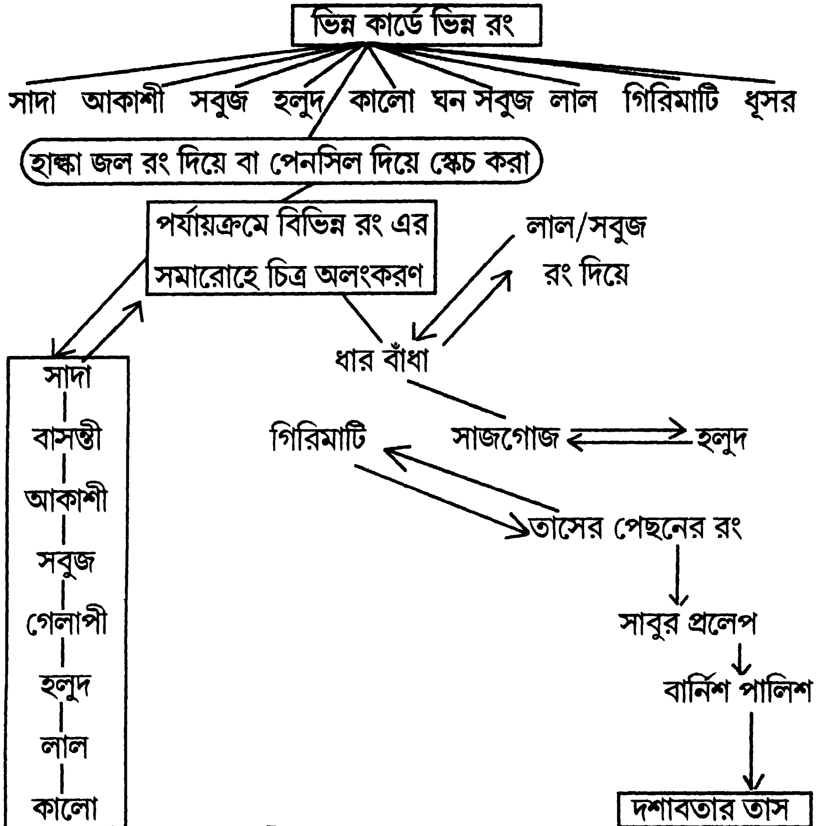
'খাড়ি' দিয়ে ধার বাঁধা

'মিশেল করা'

চিত্রহীন গোল তাস

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ

শক্ত কাপড়ের জমিনে রং করা



খরচ ও মাপের হিসাব ঃ দশাবতার শিল্পীদের একসেট দশাবতার তাস প্রস্তুত করতে প্রায় ১০-১৫ দিন লাগে। এবং এর জন্য খরচ পড়ে ২০০ - ২৫০ টাকা। বর্তমানে প্রতি সেটের বিক্রয়মূল্য প্রায় ৭০০ - ৮০০ টাকা। তবে শুধু দশটি অবতার ও একত্রে বিক্রয় হয়, ২০০ - ২৫০ টাকায়। দশাবতার তাস ও নক্সাতাস বিভিন্ন মাপের হয়। আবার মাপ অনুযায়ী ভিন্ন বিক্রয়মূল্যও ধার্য করেন দশাবতার শিল্পীরা।

নক্সাতাস	৪৮টি তাস	৪.৫″	প্রায় ১০০০/-
নক্সাতাস	৪৮টি তাস	২.৫″	প্রায় ৫০০/-
দশাবতার	১২০টি তাস	৩.৫″ - ৪.৫″	প্রায় ৭০০-৮০০/-
দশাবতার	১২০টি তাস	২.৫″	প্রায় ৭০০-৮০০/-

তাসের কথা ঃ তাস খেলার চল রয়েছে ইতিহাসের কাল থেকে। প্রাচীনকালে রাজারা তাস খেলতেন হাতে আঁকা তাস দিয়ে। সাদা কাপড় গোল করে কেটে আটা লাগিয়ে পর পর সেঁটে নানা রঙে, নানা পরিচয়ে ফুটিয়ে তোলা হত -- 'নহলা', 'আটা', 'দুরি', 'তিরি' বা সাহেব-বিবি-গোলাম। আর সেই ধারায় মল্লভূমির দশাবতারে রয়েছে -- 'মৎস্য', 'কূর্ম', 'বরাহ' থেকে 'বলরাম'। উড়িষ্যার নকসীতাসের দশাবতারকে বলে 'গন্ধিকা'। এই জাতীয় তাস ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যেমন ছিল, তেমনি ভারতের বাইরেও প্রচলিত ছিল।

দশাবতার তাস খেলা জনপ্রিয়তার বলে মল্লরাজ বাড়ীর গণ্ডী পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের কাছেও। অবশ্য বর্তমানে এই জটিল খেলাটি খেলতে পারেন বিষ্ণুপুরের কয়েকজনই। দশাবতার শিল্পী বিদ্যুৎ ফৌজদারের মতে তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন -- রঞ্জিত কর্মকার, বিশ্বনাথ মণ্ডল, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, চঞ্চল কর্মকার, অজিত কর্মকার, তিনকড়ি নাগ, মানস দাস, সৌরভ কর্মকার প্রমুখ।

খেলার নিয়ম ঃ দশাবতার তাস খেলা পাঁচ জন মিলে হয়। তবে এরা কেউ কারোর Partner নয়। তাস বাটা হয় -- প্রত্যেকের কাছে থাকে ২৪টি তাস। খেলা কখনও ডানদিক থেকে বামে এবং বাম দিক থেকে ডানে যেভাবে ইচ্ছা চলতে পারে। যার হাতে রাম অবতারের তাস আসে, সেই শুরু করবে খেলা। অর্থাৎ সেই প্রথম দান দেবে। এর সঙ্গে একটি ছোট তাস দানে চালবে। তবে এই নিয়ম কেবল সকাল বেলায় খাটবে। রাত্রে প্রধান তাস হবে 'মৎস্য অবতার', ভোরে প্রধান 'জগন্নাথ' এবং সন্ধ্যায় 'নৃসিংহ' আবার যে কোন সময় যদি বৃষ্টি আসে তবে প্রধান হবে 'কূর্ম অবতার'। এ খেলার আরও নিয়ম রয়েছে। যেমন ২৪টি করে তাস পাবার পর পরশুরামের (ভৃগুরাম) সাত, কল্কীর আট, পদ্মের নয় এবং দশ রাজার আসনের জন্য দিতে হবে। যিনি প্রথম অবতার বা 'ষ্টাটার' পাবেন তিনি তাঁর সুবিধামত খেলা আরম্ভ করবেন। দশ অবতার তাসে প্রথম পাঁচটি অবতার যেমন - মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি অবতার গুলির রাজা ও উজীরের পর দশ-ই সর্বোচ্চ স্থান, তারপর যথাক্রমে তিরি, দুরি, টেক্কার স্থান সবচেয়ে কম, বাকি পঞ্চ অবতার অর্থাৎ পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি প্রভৃতি অবতারগুলির রাজা ও উজীরের পর টেক্কা বা এক সম্মানিত কার্ড। অর্থাৎ টেক্কার স্থান সর্বোচ্চ। দশের এখানে মর্যাদা সবচেয়ে কম। 'টিপসই' 'হাতসই' 'সটিপ' 'জোড়টিপ' ও 'বোজ' প্রভৃতি এইগুলি খেলা, স্বচক্ষে না দেখলে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। পয়েন্টের উপর বাজী রেখে এই তাস খেলা হয়ে থাকে। ২৪ পীঠের এই খেলা। প্রতি পীঠে পাঁচ পয়েন্ট বলে গণ্য হয়। তবে পীঠ গুণে এই খেলার হার-জিৎ নির্ধারণ করা হয়। যেমন ১ পীঠ = ৫ পয়েন্ট যদি কেউ ৭ পীঠ পান তাহলে তাঁর পয়েন্ট হবে ৭X৫ = ৩৫ পয়েন্ট কিন্তু মূল ২৪ পয়েন্ট বাদ দিয়ে (৩৫ -

২৪) = ১১পয়েন্ট তার জিৎ হবে। আবার কেউ যদি ৪ পীঠ পান তাহলে তাঁর পযেন্ট হবে ৪ X ৫ = ২০পয়েন্ট কিন্তু মূল পয়েন্ট বাদ দিয়ে (২৪ - ২০) = ৪ পয়েন্ট তার হবে। খেলা চলে যতক্ষণ রাম এবং মন্ত্রীরা না পড়ছেন। খেলা অনেক সময় তিথি থেকে তিথি অবধি চলে। তাসের মূল্য বা Points তিথি বা দিন হিসেবে বদলায়। বাজী ধরে খেলায় টানটান উত্তেজনা বহাল থাকে। খেলা নিয়ে অসাধারণ ছড়া রচনা করেছেন দশাবতারের খেলোয়াড় সনাতন দাস ও অজিত কর্মকার (উন্মেষ · ১৯৯৮)

দশ অবতার তাসের খেলার আর্য্যা

তাসের ছবিগুলি চিনে নিয়ে, ভাল করে মিলিয়ে
গণ্ডা গণ্ডা দাও বিলায়ে
সাত ভৃগু, আট কলি, নয দশ পদ্ম কলি
প্রভুর আসন খানি দাও সাজায়ে (নামায়ে)
প্রথম অবতার যার, দু'দস্ত হবে তার
আবও হবে জোড় ভেঙ্গে সেরওয়া।
জোব টিপ, টিপসই কিংবা সটিপ,
হইলে দু'দস্ত অন্যে পাওয়া
আরও হবে জোড় ভেঙ্গে সেরওয়া।
না হইলে বোজ হবে মুঝিবে বাঁয়ে।
পনের দস্ত হলে সেরওয়া নাহি চলে।
পাওয়া দস্ত নিয়ে বোজ হয়ে যায়।
হাত সই করে কেউ পাওয়ার আশায়,
ঠিক ঠিক রেখে বাকী ফেলে দিয়ে যায়,
শেষ পাঁচ দস্তে, নাই অধিকার।
ঠিক ঠিক হাত সই এখেলা যদি পড়ে
অন্য অনা সব খেলোয়াড় পড়ে ফাঁপরে
এক জিৎ হয় পাঁচ দস্ত পরে
খেলা চলে প্রভু পদে প্রণাম দিয়ো।

শিল্পশৈলী ঃ দশাবতার তাসের শিল্পশৈলীতে ছাপ রয়েছে মুঘল, ওড়িশা, রাজপুত, বাংলা ও আদিবাসী সংস্কৃতির কলাশৈলীর। এ শিল্প প্রাচীন। যার প্রমাণ পদ্মপানি বুদ্ধকে অবতার হিসাবে দশাবতারে স্থান দেওযা। বর্তমানে এ শিল্প 'Meseum Peace' এর দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই সূত্রে জানাতে হয় দশাবতার তাসের সংগ্রহ রয়েছে আমাদের দেশের মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ, দিল্লী, বাঙ্গালোর, কলকাতা প্রভৃতি স্থানের সংগ্রহ -শালায়। সংগ্রহ রয়েছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও যেমন ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালি, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, উজবেকিস্তান, সুইজারল্যাণ্ড, মায়ানমার, চীন, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের সংগ্রহ-শালাতেও।

শিল্পীদের বারমাস্যা ঃ সাম্প্রতিক সময়ে দশাবতারের ঐতিহ্য থমকে দাঁড়াবার মুখে। আর দাঁড়াবেই না বা কেন? এখন এই তাস খেলার জন্য কেও তাস কেনেনা বা দশাবতার তাস খেলার পূর্বের সেই জোয়ারও নেই। শুধুমাত্র সংগ্রহশালা গুলো মাঝে মাঝে 'অর্ডার' দিয়ে দশাবতার তাস কেনে। কখনো বা পর্যটকবা সখের বশে কিনে ফেলে দশাবতার। আবার কখনো দশাবতার তাসের বর্তমান হতাশাকে মুছে ফেলতে ব্যর্থ চেষ্টাতেও কিনে ফেলে কিছু কিছু লোকসংস্কৃতিপ্রেমী। এই সূত্রে জানাতে হয়, বিদেশী পর্যটক বা গবেষকরা অনেক সময় বেশ একটু চড়া মূল্য দিয়ে দশাবতার তাস কেনে। যার জন্য এই শিল্পীদের একটু বেশী আকর্ষণ রয়েছে বিদেশী পর্যটক বা গবেষকদের প্রতি। এ ঘটনা বছরে ৪-৫ বার ঘটতে পারে। তাতেই কি তাদের সংসার চলে? নেই কোন সরকারী অনুদান। 'লটারী' পাওয়ার মত মাঝে মাঝে কখনো কখনো কিছু সাহায্য পান, তা খুবই সামান্য। এঁদের অবস্থা কি, তা শাঁখারী পাড়ার সমগ্র বাড়ি ঘরের মধ্যে এঁদের ঘরবাড়ি দেখলেই বোঝা যায়।

বর্তমানে তাদেরকে 'সময়' বাধ্য করেছে অন্য পেশা গ্রহণ করতে। অবশ্য এদের মধ্যে দু-একজন সামান্য মাইনের সরকারী চাকরী করেন। তবে বেশীর ভাগই দশাবতারের উপর নির্ভর। এই নির্ভরতা দশাবতার শিল্পীদের কাছে এখন দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে কেউ কেউ দোকান করেছেন পান-বিড়ির। অনেক সময় বাইরের মানুষ দেখলে এরা বলে ওঠেন — " কোলকাতাতে ছোট-খাটো কাজ পাওয়া যাবেক লয়! "

এত সবের মধ্যেও তারা একেবারে সমূলে উপড়ে ফেলতে পারেননি দশাবতার শিল্পকে। মল্লভূমির রাজার আনুগত্যে ফৌজদার পরিবারের মানুষগুলোর মধ্যে যে শিল্পসত্তা গড়ে উঠেছিল — সেই অতীতের ঐতিহ্যের ভাঁজে আটকে পড়া সত্তার টানেই এখনো এঁরা কাপড়ের বোর্ডের উপর রং-তুলি নিয়ে 'আঁকি-বুকি' করেন। তাই হয়ত একদিন, আর্থিক সহযোগিতা, মানসিক সহমর্মিতা ও উৎসাহের অভাবে একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে — বাঙলার এই শিল্প সমৃদ্ধ লোকায়ত ঐতিহ্য।।

উৎস সূত্র ঃ—

১. ক্ষেত্রসমীক্ষা (২০.৩.৯৮) ঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া জেলা।

তথ্যদাতা ঃ বিদ্যুৎ ফৌজদার, প্রশান্ত ফৌজদার।

২. "বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ" — সম্পাঃ ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, কলকাতা।

৩. 'বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস' : চঞ্চল কর্মকার, 'উন্মেষ', সম্পাঃ মুকুল গোস্বামী, বাঁকুড়া, ১৯৯৮।

উৎসর্গ - লোকায়তশিল্পের নিরিখে বাঁকুড়ার বেলমালা

লোকায়তশিল্পের বেশ খানিকটা অংশ উৎসর্গ শিল্পের আধারে বাঁধা অর্থাৎ ধর্মীয় অনুশাসনের আবেশে আচাব-অনুষ্ঠানকে আবিষ্ট করে উৎসর্গ শিল্পেব গড়ে ওঠা। আর এই গড়ে ওঠা উৎসর্গ শিল্পের একটি অনন্য নিদর্শন বাঁকুড়ার বেলমালা শিল্প। যাকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়া জেলার বেশকিছু সংখ্যক হতদরিদ্র মানুষ — তাদের জীবনকে অক্ষত রেখে টেনে নিয়ে চলেছে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে।

বাঁকুড়া জেলার মানচিত্রের পরিসীমায় – এবারে দেখা যাক বেলমালা শিল্পের কেন্দ্রগুলি। বিষ্ণুপুর সন্নিহিত অঞ্চল -- দ্বারিকা, বাঁকুড়া-১ ব্লকের কেঞ্জাকুড়া, বেলিয়াড়া, বাঁকুড়া ২ ব্লকের মোবাবকপুব প্রভৃতি গ্রামে ব্যাপকভাবে বেলমালা তৈরী হচ্ছে। এছাড়া ছাতনা, শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি, বড়জোড়া, জয়পুর, বায়পুর, পাত্রসায়ের, সোনামুখী প্রভৃতি ব্লকেও বেলমালা শিল্প মহীরূহের আকার নিয়েছে।

বেলমালা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। বৈষ্ণব ধর্মের আচারেব অঙ্গ হিসাবে বৈষ্ণবেরা বেলমালা ভক্তির অনুষঙ্গে গলায় ধারণ করেন। এছাড়া হিন্দুদের সামাজিক অনুশাসনেব বিশ্বাস-সংস্কার কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে অর্থাৎ অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি আচার অনুষ্ঠানে বেলমালা একান্তভাবে আবশ্যক। 'মালা' গলায় ধারণ করার রীতি সভ্যতা সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে চলে আসছে। তবে 'বেলমালা' এবং 'তুলসীমালা' ধারণের রেওয়াজ ব্যাপকতা লাভ করে – মনে হয় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কাল থেকে অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রসারের সময়।

প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রশ্ন জাগে হঠাৎ বাঁকুড়া জেলায় এ শিল্পের প্রসার ঘটল কেন? তার একটাই সহজ উত্তর বাঁকুড়াজেলায় বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ও আনুগত্য। একই সঙ্গে স্মরণযোগ্য বিষ্ণুপুরের মল্লরাজদের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আনুগত্য, গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি। মল্লভূমের রাজারা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করায় প্রজারাও এই ধর্ম গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় 'রাঢ় আকাদেমি'র সম্পাদক অচিন্ত্য জানার অভিমত — "শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিষ্ণুপুরে আগমন, অবস্থান, মল্লরাজার গুপ্তবৃন্দাবন পরিকল্পনা বাঁকুড়া জেলার আপামর জনসাধারণকে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। অনেক মানুষ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। সেই বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাব এখনও বিদ্যমান। বাঁকুড়া জেলার গ্রামে-গঞ্জে রাসমঞ্চ, হরিমেলা, দোলতলা, বেলমালা তৈরি, বেলমালার ব্যবসা, বেলমালার ব্যবহার তার প্রমাণ।"

সমগ্র বাঁকুড়া জেলাতে স্থানে স্থানে বেলামালা শিল্পের প্রসার থাকলেও – আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য বেছে নিই বিষ্ণুপুর সন্নিহিত 'দ্বারিকা' গ্রামটিকে। এর কারণ হিসাবে

বলা যায় — বাঁকুড়া জেলাতে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য বৈষ্ণব এবং হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ বেলমালা তৈরি করেন। কিন্তু 'দ্বারিকা' গ্রামে শুধুমাত্র মুসলমান রমণীরাই এই মালা সৃজন করে বংশপরম্পরায়। এ বিষয়টির তৎকালীন ও বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অসাধারণ সামাজিক - সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে।

'দুয়ার খাঁ' নাম থেকে ক্রমশ পরিবর্তনের পালায় বর্তমানে এ গ্রামটির নাম দ্বারিকা হয়েছে। বিষ্ণুপুর থেকে বাসপথে দুই থেকে তিন কিলোমিটারের মধ্যে এ গ্রামটির অবস্থান। এ গ্রামটিকে লালমাটির উপর কালো পিচের রাস্তা দুভাগে ভাগ করে দিয়েছে। যার একদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাস এবং অপরদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের বাস। সাম্প্রদায়িক ভেদরেখাকে অবনমন রেখে মুসলমান রমণীরা তাদের শিল্পকুশলী দিয়ে বর্তমানেও সৃজন করে চলেছে বেলমালা। তবে অবশ্যই বাঁচার তাগিদে।

দ্বারিকাতে প্রায় দেড়শ পরিবারের বসবাস। যার মধ্যে ৮০ - ১০০টি পরিবার এই শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যাদের সম্বল খড়ের চালের মাটির ঘর এবং কয়েকটি গৃহপালিত পশু। বেশীর ভাগ মানুষের জমি-জায়গা নেই বললেই চলে। মেয়েরা বেলমালা তৈরি করে বা বিড়ি বাঁধে এবং পুরুষেরা মজুর খাটে — এভাবেই বাঁধা তাদের সাংসারিক উপার্জনের কাঠামো।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এবারে এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক দ্বারিকা গ্রামের গোড়াপত্তন। এবং সেই সঙ্গে দেখব দ্বারিকা গ্রামে বেলমালা শিল্পের গড়ে ওঠা।

ষোড়শ শতাব্দীতে মল্লভূমের মল্লরাজা হলেন বীর হাম্বীর। ইনিই প্রথম বাংলার মুসলমান নবাবের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং বার্ষিক ১০,৭০০ টাকা করে কর দিতে বাধ্য হন। এর পরে মল্লরাজারা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। সেসময় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মুসলমান নবাবেরা কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতেন না। সম্ভবতঃ রঘুনাথ সিংহের সময়েই দ্বারিকা গ্রামের পত্তন হয়। এ প্রসঙ্গে অচিন্ত্য জানা জানান — "রায় পদবী ধারী এক কায়স্থকে জমিদারী দিয়ে এখানে বসান হয়। সেই জমিদারের দুই ছেলে — বড় ভাই দ্বারিকায় থাকলেন, ছোট ভাই গেলেন পাশের গ্রাম মথুরায়। কিন্তু ওঁদের মধ্যে বিবাদ ছিল। বিবাদ চরমে উঠল। ছোট ভাইকে জব্দ করার জন্য বড়ভাই পাঁচজন শক্তিশালী লাঠিয়াল এনে সোনামুখী রাস্তার পূর্বদিকে ঘর তৈরি করে দিয়ে ওদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। তা দেখে ছোটভাই ছয়জন মুসলমান লাঠিয়াল এনে খড়ার পুকুরের পাড়ে ওদের বসান। বড়ভাই এবং ছোটভাই - এর মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকত। শেষে ঝগড়াঝাটিতে ওরা ধ্বংস হতে থাকে। উভয় পক্ষের লাঠিয়ালরা প্রজা হিসাবে জমি চাষ করেন, পরবর্তীকালে জমিদারের কাছ থেকে তাঁরা জমি খরিদ করে দখল করলেন। পরপর তাঁদের বংশ বৃদ্ধি

হয়। এবং নতুনভাবেও কিছু মুসলিম পরিবার এখানে এসে বসবাস করতে থাকেন। দ্বারিকা গ্রামের বাসিন্দারা সেই লাঠিয়ালদের বংশধর।'' এছাড়াও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাববিনিময়ের সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে আরো জানান — মল্লভূমের রাজারা বৈষ্ণব। তাঁর অধীনে জমিদারও ভক্ত, অনেক প্রজাও বৈষ্ণব। জমিদারের লাঠিয়াল মুসলমান হলেও বৈষ্ণব এবং মুসলমান উভয়ে উভয়ের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। বেলমালা বৈষ্ণব বা হিন্দুদের আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য, বেলমালা মুসলমান রমণী তৈরী করলেও কোন পক্ষের বাধা নেই। বরং মুসলমান রমণীগণ দু'পয়সা রোজগার করার সুযোগ পান।

বেলমালা শিল্পীদের সামান্য পরিচয়ের প্রতিভাসে এবারে প্রবেশ করব শিল্পের উপাদান, সরঞ্জাম, কর্ম-পদ্ধতি, মূলধন-বিপণন ব্যবস্থা এবং বর্তমান আর্থ-সামাজিক -সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প ও শিল্পীদের অবস্থানের আলোচনায়।

শিল্পের নাম দেখেই বোঝা যায় — এ শিল্পের মূল প্রায়োজনিক উপাদান 'বেল'। বেলমালা তৈরির জন্য দু'ধরনের বেল পাওয়া যায় — শাঁসযুক্ত বেল এবং শাঁসবিহীন বেল। বাঁকুড়া জেলা ছাড়াও পুরুলিয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান থেকে বেল এখানে আমদানি হয়। আবার ব্যবসায়ী বা মহাজন উড়িষ্যা থেকে লরী বোঝাই করে বেল এনে বাঁকুড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রি করে। আবার মালা তৈরি হলে সেই মালা ওই ব্যবসায়ীরা খরিদ করে। 'দ্বারিকা' গ্রামের শিল্পীরা বিষ্ণুপুর ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের বাজার বা হাট থেকে এই বেল সংগ্রহ করেন।

শিল্পকর্মের জন্য বিভিন্ন মাপের বা আকারের বেল পাওয়া যায়। নিম্নের মাপের বেল একটু বেশী পরিমাণে দেখা যায় —

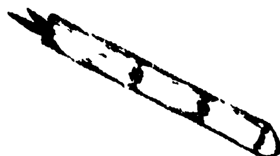
২″ X ২″	৩″ X ২″
৪″ X ৩″	৪″ X ৩.৫″ ইত্যাদি।

প্রতি ১০০টি বেলের দাম ১০ - ১৫ টাকা থেকে ৩০/৪০ টাকা বা ৫০/৬০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। আবার বস্তা হিসাবেও বিক্রি হয়। এক বস্তার দাম প্রায় ২৫০ টাকা। এছাড়া বেলের খোলা ২৫ টাকা পণ হিসাবে অর্থাৎ ৮০টি বেলের খোলা ২৫ টাকায় শিল্পীরা সংগ্রহ করেন। এবং সর্বশেষে বেলখোলা থেকে মালা তৈরির জন্য 'কুচ্‌ড়ি' বা 'চাকতি' তুলে নেওয়ার পর খোলার বাকি অংশ জ্বালানী হিসাবে শিল্পীরা ব্যবহার করেন।

বেলমালাশিল্পীরা মালা তৈরির জন্য যন্ত্রপাতি হিসাবে নিজেদের হাতে গড়া ছোটখাটো সরঞ্জামই ব্যবহার করে। যার জন্য বেশী অর্থ ব্যয় করতে হয় না। পর্যায়ক্রমে সরঞ্জামের নাম - কাজ - উপাদান (নির্মিত) চিত্র সহকারে দেখানো হল —

ছক্ :

ছোট দু'ফলা যুক্ত
বাঁশের কঞ্চির খানিকটা
অংশ। 'কুচড়ি' বা 'চাকতি'
তোলার কাজ করে। বিভিন্ন আকারের হয়।



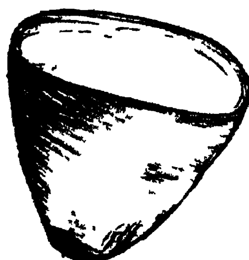
ধনুক :

বাঁশের তৈরি ছোট
ধনুক। সরু সুতোর দড়ি
লাগানো থাকে, যা
'ছিলা'র কাজ করে।
ধনুক ছক্‌কে ঘুরাতে
সাহায্য করে।



পিচ্‌কারী :

গাছের ফলের অংশ
দিয়ে তৈরি। ছকের
পেছনের অংশে এটি
লাগিয়ে ধনুকের সাহায্যে
ছক্ ঘোরানো হয়।।

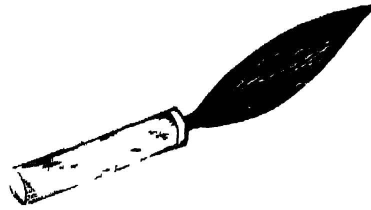


সূঁচ (সুঁই) :

সরু তার দিয়ে তৈরি।
মালা গাঁথার কাজে
ব্যবহার হয়।

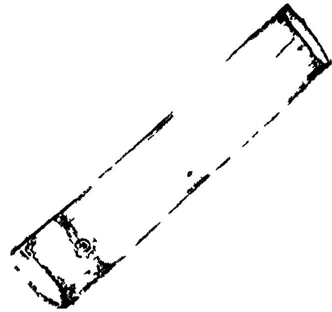


উগা :



সামনের অংশ লোহার
পাত দিয়ে তৈরি।
পেছনের অংশ বাঁশের।
ছকেব কলাকে ধার
দেওয়ার কাজে ব্যবহার হয়

চোঙা :



মোটা বাঁশের একটি
'গিরি' সহ এক হাত মত
অংশ। যার মধ্যে সমস্ত
সরঞ্জাম রাখা হয়।

এছাড়াও প্রয়োজন হয় করাতের, কপি ও আষ্টভেলিব ইত্যাদি।

বেলমালা তৈরীর কর্মপদ্ধতিতে প্রথমেই দেখা যায় কাঁচাবেলকে সেদ্ধ করে ভেতরের শাঁস বের করে নেওয়া হয়। অবশ্য শাঁস বের করা হয় গোটা বেলকে কাটারি দিয়ে দুভাগ করার পর। গোটা বেলকে দুভাগ করার পর শাঁস বের করাকে শিল্পীরা 'বেলাতি' বলে। এরকম অনেক 'Meta Language' বা বৃত্তিগতভাষায় তারা কাজের বিভিন্ন পর্যায়কে নির্দেশ করে।

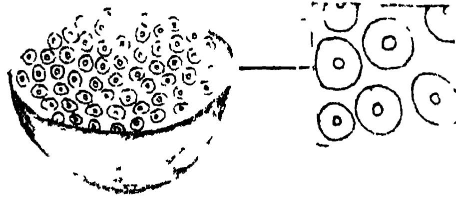
বেলাতি করা :



এরপর তারা অর্ধেক বেলখোলাটি মাটিতে রেখে দুপা দিয়ে চেপে ধরে বেল খোলার মধ্যে বাঁ হাত দিয়ে 'ছক্' ধরে ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে 'ধনুক' ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দাগ কেটে

নেয় এক একটি 'কুচড়ি' বা গোলাকার চাকতির। যা তাদের পোষাকি ভাষায় 'ছাঁচ করা'। এইভাবে একটি বেলের অর্ধেক অংশ থেকে ১০০ থেকে ১৬০টি 'কুচড়ি' পাওয়া যায়। অন্যভাবে এই পর্যায়টিকে 'খোলাদাগা'ও বলে।

বেলখোলার উপর ছাঁচা করা :

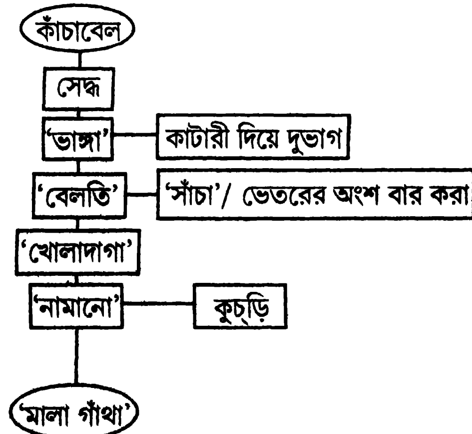


এক্ষেত্রেও ছকের দুটি ফলার একটি ফলা কুচ্‌ড়ির ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে একটি ছোট ছিদ্র করে এবং সেই ছিদ্রের চারদিকে সমান দূরত্বে আর একটি ফলা দিয়ে বৃত্তাকারে বেল খোলার কিছু অংশ কেটে গভীর করে দেয় কিন্তু বেলখোলার সঙ্গে লেগে থাকে। অনেকটা কম্পাসের কাজ করে এই 'ছক্'। পরে সেই 'কুচ্‌ড়ি' গুলো ছকের সাহায্যে বেলখোলা থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়। এপর্যায়কে শিল্পীরা 'নামানো' বলে।

এই সমস্ত পর্যায়ে মুসলীম রমণীদের অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হয়। কেননা একটু অন্যমনস্ক হলেই বেলখোলা থেকে ছক্ পিছলে সোজা পায়ে ফুটে যায়। অনেকের পায়ে এই ক্ষতের চিহ্নও দেখা যাবে। কিন্তু এসব হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই টিটেনাস্ প্রতিষেধক ইন্‌জেনকসন ভুলেও নেয় না। হয়তবা দেহের ক্ষতির সম্ভাবনার থেকে অর্থের অভাবটাই তাদের কাছে মস্তবড় হয়ে উঠে।

সবশেষে সুঁচ ও সুতো দিয়ে 'কুচড়ি' গুলি নিয়ে একেরপর এক মালা গেঁথে চলে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে থেকে বয়স্কা মহিলা পর্যন্ত।

সুতরাং বেলমালা প্রস্তুতের — সমগ্র কর্মপদ্ধতিকে পর্যায় অনুসারে রেখাচিত্রের মাধ্যমে এভাবে দেখানো যেতে পারে —



মোটামুটি প্রায় ৩০০ - ৫০০ টাকা মূলধন হলেই বেলমালা তৈরির কাজ শুরু করা যায়। সারাদিন এ কাজ করে শিল্পীরা ২০ - ৩০ টাকা অনায়াসেই আয় করতে পারে। তৈরি মালা ১ ফুট করে ২০টি গাছিকে 'এককড়ি' বা 'কুড়িখি' বলে -- যা বাজারে ৮ - ১০ টাকায় বিক্রী হয়। অন্যভাবে, প্রতিটি বেলমালার দাম ৩০ পয়সা। আর শ'দরে হলে একশত বেলমালার দাম ৩০ - ৪০ টাকা। শিল্পীদের দৈনিক আয় থেকে বেলের দাম এবং সুতোর দাম বা অন্যান্য খরচ বাদ দিলে গড়-পড়তা তারা মজুরী পায় ৫-৬ টাকা। এই ভাবেই দ্বারিকা গ্রামের মুসলীম রমণীরা ঘর-সংসারের কাজের ফাঁকে এই কাজ করে কোন মতে তাদের জীবন অতিবাহিত করে। তবে অবশ্যই সরকারী সহযোগিতা ছাড়া।

তাই অকস্মাৎ আমাদের গ্রামে অনুপ্রবেশে বেশীরভাগ রমণীর মুখে সাবলীলভাবে ফুটে ওঠে -- "লোন দিবেক কি?" বা "মনে হয় সরকারী লোক আইছে" বা "আমাদের কিছু কি হবেক".. তারপর ভ্রম কাটার পরে আক্ষেপ করে বলে ওঠে "কিছু হবেক লয় ...."

এরকম আক্ষেপ তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তারা যে ভাবে জীবনযাপন করে -- তাতে তাদের কোন বড় ধরনের অভিলাষ বা আশা নেই। শুধু একটু ভালো মন্দ খেয়ে পরে বাঁচতে চায়।

তাদের মুল সমস্যা হচ্ছে ন্যায্য দামে কাঁচা বেল পাওয়া। বেল আমদানী ব্যাপারে একজন দু'জন ব্যবসায়ী বা মহাজন আছে -- তারা খুশী মত দাম নিয়ে বেল বিক্রি করে। তাছাড়া তারাই আবার তৈরি বেলমালা শিল্পীদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে বেলমালার দাম তারাই ঠিক করে। বাঁকুড়ার মাত্র দু'একজন বেলমালা ব্যবসা করে -- কাজেই এরা জানতেও পারেনা -- কোথায় বাজার -- কোথায় যায় -- কি দরে বিক্রি হয়।

দ্বারিকা গ্রাম ছাড়া বাঁকুড়ার অন্যান্য অঞ্চলে বামুনবাঁধ, হাটগ্রাম, কেঞ্জাকুড়া, ছাতনা, শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটী, বড়জোড়া, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, জয়পুর, রায়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে পুরুষ মহিলা যৌথ ভাবে বেলমালার কাজ করে আয় করে। সুতরাং বাঁকুড়া জেলার বহু পরিবার বেলমালার উপর সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে যে নির্ভর করে -- সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। তবে বর্তমানে মালার দাম আগের তুলনায় কম। যার ফলে অনেক মহিলাকেই বিড়ি বাঁধতে দেখা যাচ্ছে। এরকম ক্রমশ ঘটতে থাকলে এদের মধ্যেও ঘটে যাবে 'Transfer of Trends'।

দ্বারিকার মানুষদের নেই জাতপাতের বিচার, নেই কোন ধর্মীয় গোঁড়ামি। রয়েছে অভাব। এই অভাবের তাড়নায় উদয়াস্ত পরিশ্রম করে তারা যে আয় করে তা তাদের

পরিশ্রমের পক্ষে যথেষ্ট নয়। নারজু খাতুন ও সহকর্মীদের কথায় -- 'চলে যাই', আবার বেলমালা শিল্পের ভবিষ্যতের কথায় লুৎফা বেগম, মরতুবা বেগমদের দৃঢ় বিশ্বাস -- "একাজ ভবিষ্যতেও থাকবে -- না হলে খাবো কি!"

তবে এ বিশ্বাস অচিরেই ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে, যদি না শিল্পীদের হাতে ন্যায্য দামে কাঁচা মাল, যথেষ্ট মূলধন ও সুষ্ঠু বিপণনের ব্যবস্থা করা যায়।

উৎস সূত্র ঃ—

১. ক্ষেত্র সমীক্ষা (ব্যক্তিগত/C.C.C.A-র পৃষ্ঠপোষকতায়) তাং ১৯/৩/৯৮
গ্রাম : দ্বারিকা; বাঁকুড়া জেলা।

২. সাক্ষাৎকার : অচিন্ত্য জানা (সম্পাদক : রাঢ় আকাদেমি), বাঁকুড়া।

৩. সাক্ষাৎকাব : শৈলেন দাস (সম্পাদক : বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি আকাদেমি), বাঁকুড়া।

৪. বাঁকুড়ার অর্থনীতিতে লোকশিল্প (১ম খণ্ড) ঃ অচিন্ত্য জানা, বাঁকুড়া, ১৯৯৪

তথ্যদাতার নাম : ক) নারজু খাতুন (দ্বারিকা)।
খ) লুৎফা বেগম (দ্বারিকা)।
গ) মরতুবা বেগম (দ্বারিকা)।

পুরুলিয়ার মুখোশশিল্প

ভোরেব আলো ভাল কবে ফোটাব আগেই আধো-অন্ধকারে ওরা ছুট্ লাগায় মাঠের দিকে। সংখ্যায় ওরা শতাধিক। সেখানে ফুলে ফলে ঘেরা জমির বুকে ওবা নানা কসরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একটানা দু ঘণ্টা ঘাম ঝবিয়ে তবেই বিরতি। তারপবে ছোলা-গুড় কিংবা চা-রুটি খেয়ে পড়তে বসে। পড়া শেষে চান-টান করে ফ্যান-ভাত খেয়ে স্কুলে যাওয়া। বিকেলে ফের ওরা মাঠে হাজির। তবে সকালের মতো খালি হাতে নয়, তখন ওদের অনেকেরই হাতে থাকে মুখোশ। ওই মুখোশকে ঘিরেই নানা স্বপ্নের জাল কচি-কাঁচাদের চোখে।

এ কোন সরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নয়। খেলাধুলো সংক্রান্ত কোনও প্রস্তুতি শিবিবও নয়। অনাথ-অসহায় ওই কচি-কাঁচাবা ছৌ নাচে ওস্তাদ হয়ে ওঠার স্বপ্নে মশগুল হয়ে রয়েছে। আর সরকারী সাহায্য ছাড়াই দু-দ'শকেরও বেশি সময় ধরে ছৌ নাচেব ওই স্কুল চালাচ্ছেন এক ডাক্তার। বলরামপুরে গিযে ওই স্কুলের কথা বললে অবশ্য কেউই চিনবে না। বলতে হবে সুখেন ডাক্তারের আশ্রম। যে কেউ আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দেবে-'ওই হোথা'। আলোচ্য প্রবন্ধে ছৌ নাচ নয় তার সাজ-পোষাকের মধ্যে আবশ্যিক যে মুখোশ — সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

'মুখোশ' লোকায়ত নৃত্যের একটি অন্যতম অঙ্গ। যার প্রমাণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকায়ত নৃত্য — 'তিয়াত্তম' (কেরালা), 'থেরায়াত্তম', 'লাম' নাচ ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গেও রয়েছে গম্ভীরা নৃত্য, মুখাখেইল নৃত্য, রাভানৃত্য, মেচনৃত্য প্রভৃতিতে অসাধারণ মুখোশের ব্যবহার। ঠিক এরকমই মুখোশ নৃত্য 'ছো' নাচ বা 'ছৌ' নাচ। যার বিস্তার বাংলা, বিহার এবং ওড়িশায়। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার ছৌনাচও বাকি অঞ্চলগুলোর ছৌনাচের মতই ঐতিহ্য ও শৌর্যে অসামান্য। যার গুণেই মানভূমও অসামান্য। অসামান্য লোকশিল্পকলা পুরুলিয়ার 'মুখোশ শিল্প'।

পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডী থানার চড়িদা গ্রামের শিল্পীরা এই মুখোশ তৈরীতে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী। প্রধানত দুটি গ্রামে এই শিল্পটি কেন্দ্রীভূত, চড়িদা এবং জয়পুর থানার ডুমুরডিহি। বাগমুণ্ডি পাহাড়ের কোলেই বাগমুণ্ডি গ্রাম। পুরুলিয়া শহর থেকে বাস যোগে ৫৭ কিলোমিটার রাস্তা, বাসস্ট্যাণ্ডের গায়েই বাঘমুণ্ডি থানা। এখান থেকে ১ কিলোমিটার এগোলেই চড়িদা গ্রাম। রাস্তার দুধারেই সারি সারি মুখোশ শিল্পীদের ঘর। গ্রামে প্রায় ৪০-৫০ ঘর মুখোশ শিল্পী বাস করেন। ঘর পিছু তিনজন করে ধরলে শতাধিক শিল্পী মুখোশ শিল্পে নিযুক্ত আছেন। এঁরা সবাই জাতিগত বিভাগে সূত্রধর, এরাই মুলত: মুখোশ শিল্পের সৃজনশীল শিল্পী। তবে বর্তমানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও মুখোশ শিল্পের

সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। কয়েক পুরুষ আগে বাঘমুণ্ডির রাজা বর্ধমান থেকে এই সূত্রধর সম্প্রদায়কে এখানে এনেছিলেন এবং অনুমান করা হয় মূলত হিন্দু ধর্মানুসারী প্রতিমা নির্মাণের জন্য। কিন্তু কালক্রমে প্রতিমা নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ছৌ-নাচের বিবর্তনে এঁরা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেন।

যে শিল্পীরা মুখোশ তৈরী করেন তাঁরা নিরক্ষর বা স্বল্প সাক্ষর হলেও তাঁদের রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের চবিত্রগুলো সর্ম্পকে ধারণা আছে। বংশ পরম্পরায় একাজ করায় চরিত্রগুলির রূপ তাদের স্মৃতি পটে ছবির মতো আঁকা থাকে। অনেকের বাড়িতে খুব পুরানো সচিত্র রামাযণ ও মহাভারত দেখা যায়। ছোটরা সেই ছবি দেখে আঁকে কাগজে। যাকে এঁরা বলেন 'লেখা'। যে সব চরিত্রের মুখোশ তৈরী হয় তার তালিকাটি দীর্ঘ। গণেশ, দুর্গা, কার্তিক, মহিষাসুর, মহাদেব, দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ বিভীষণ, তরণী সেন, মারীচ, কালনেমী, মন্দোদরী, সুলোচনা, ইন্দ্র, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন নকুল, অভিমন্যু, সহদেব, সুভদ্রা, দ্রৌপদী, ঘটোৎকচ, কর্ণ, বৃষকেতু, তাড়কা, বাল্মীকি, শুম্ভ-নিশুম্ভ, সিংহ, ব্যাঘ্র, গো-সিংহ, বিদুর, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, কিরাত-কিরাতনী, জটায়ু, দৈত্য-দানব, বকাসুর, ভৃগু, তাবকাসুর, শঙ্কাসুর, করলাসুর, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণাচার্য, জয়দ্রথ, দুর্যোধন, কৃপাচার্য, দু:শাসন, দুন্দুবীর, মনসা, চাঁদবেনে, বরাহ, ময়ূর, গরু, ঘোড়া, সিংহ, রাক্ষস, যম, চন্দ্র, সূর্য, বেহুলা, লখিন্দর, সূর্পনখা, কুম্ভকর্ণ, মহীরাবণ, মুনি, গরুড়, সর্প, বৃক্ষাসুর, দক্ষরাজ, কুবের, বরুণ প্রভৃতি শতাধিক রকমের মুখোশ।

মুখোশ তৈরীর শিল্পীরা বিশ্বাস করেন যে, নাচের সময়ে যে দেব-দেবীর মুখোশ তাঁরা পরেছেন এবং দেবদেবীর চরিত্রে তাঁরা অভিনয় করেছেন; সেই দেবদেবীর 'কৃপা' বা 'ভর' হয় তাদের ওপর। তারাই তাদের শক্তি দেন এবং এই বিশ্বাস থেকেই নাচগুলি এত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই মুখোশ ছৌনাচের অভিনয়ে শিল্পীর অভিব্যক্তি প্রকাশে কতটা সহায়ক? এর উত্তরে গান্ধীরাম মাহাতো বলেন " দেখুন কেনে ফটোগ্রাফটা তো দাঁড়াই আছে, কিছু বল্‌ছে নাই, তবে ভাব তো আছেই; তেমনি মুখোশও।" কিংবা একথাও সত্যি যে "মুখোশ কোনো কথা বলতে পারছে নাই, ইসারাই বুঝেলেন।" বস্তুত ছৌ-নাচ দেখতে দেখতে মনে হবে এটা মূকাভিনয়ের একটি রকমভেদ।

এবার আসা যাক, এই মুখোশের নির্মাণ পদ্ধতি প্রসঙ্গে। এই মুখোশ তৈরী করতে প্রয়োজন হয় মাটি, কাগজ, আঠা, পুরানো কাপড় (পাতলা বা মিহি সুতী কাপড় হলেই ভাল, সাধারণত ধুতির কাপড় ব্যবহৃত হয়), মেটে রঙ এবং মুখোশের বিষয় অনুযায়ী সাজসজ্জা।

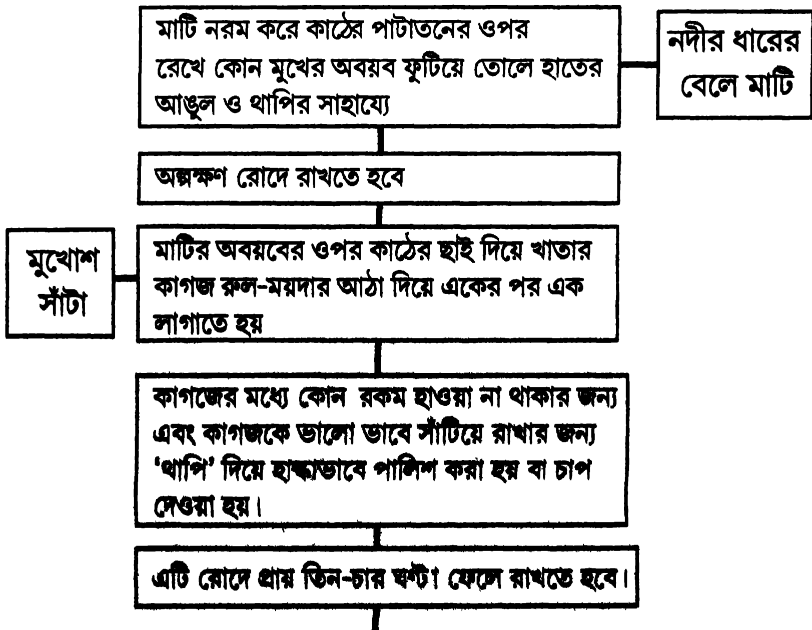
প্রথমে একটা তক্তার উপরে নরম মাটি দিয়ে মুখোশের আকৃতি গড়া হয়। এই আকৃতিটি সাধারণত একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মাথার সমান। এটাকেই বলা হয় 'ছাঁচ' বা 'ছাঁচা'। এতে খুব সূক্ষ্ম রেখা দ্বারা চোখ, মুখ, কান, ঠোঁট, গালের মোটা মোটা ভাঁজ ইত্যাদি সবই করা হয়। এটা একটু শুকিয়ে নিয়ে এর উপর আঠা দিয়ে কাগজ লাগানো হয়। তবে এর উপরে কাগজ লাগাবার আগেই পাতলা জালি ন্যাকড়ায় ছেঁকে নেওয়া ছাইয়ের মিহি গুঁড়ো ছাঁচার সর্বাংশে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই ছাই লাগাবাব জন্যে ন্যাকড়ায় নরম ছাই নিয়ে একটা ছোট পুঁটুলি করে রাখা হয়, এই পুঁটুলি আলতো ভাবে ছাঁচের উপর ঠুকতে হয়। ছাইগুঁড়ো লাগাবার ফলে মুখোশটি ছাঁচা থেকে সহজেই খুলে আসে। আজকাল কেউ কেউ ছাইয়ের পরিবর্তে বাজার থেকে আমদানী করা ফ্রেঞ্চ চকের গুঁড়োও ব্যবহার করছেন। আবার কাগজের ক্ষেত্রে সাধারণত নিউজপ্রিন্ট অচল, অন্যান্য সব কাগজই চলে, তবে খুব মোটা কাগজ হলে কাজ করার অসুবিধা হয়। তরল আঠায় কাগজের টুকরো ভিজিয়ে নরম করে ছাঁচার উপর ভালভাবে সাঁটা হয়। এই আঠা ময়দা এবাকুট বা তেঁতুলবীচির হতে পারে। এভাবে সাধারণত আট-দশ পরত কাগজ পরপব সাঁটানো হয়। কাগজ লাগানো হয়ে যাবার পর পর কিছুক্ষণের জন্য রোদে দেওয়া হয় যাতে একটু শুকিয়ে আসে। ইতিমধ্যে আরো কয়েকটা কাজ সেরে রাখতে হবে। প্রথমত পরিষ্কার নরম মাটি-একটুও কাঁকর, ঘাস বা ঘাসের শিকড় ইত্যাদি না থাকে এমন ভাবে বেছে পরিষ্কার করে নিয়ে চট্‌কে চট্‌কে মাটিটাকে খুব মোলায়েম করে তৈরী করতে হবে। আর দরকার মাটির গোলা - যার আঞ্চলিক নাম 'কাবিস'। এটাও পরিষ্কার মাটির বালি কাঁকরহীন একটি প্রায় তরল সংস্করণ-অনেকটা ক্ষীরের মতন। হাতের কাছে পরিষ্কার পুরানো সুতী কাপড়ের টুকরোও রাখা থাকবে। একটা মাঝারি পাত্রে সাধারণ জল কিছুটা এবং নানা মাপের 'থুপি' যন্ত্রও হাতের কাছে দরকার।

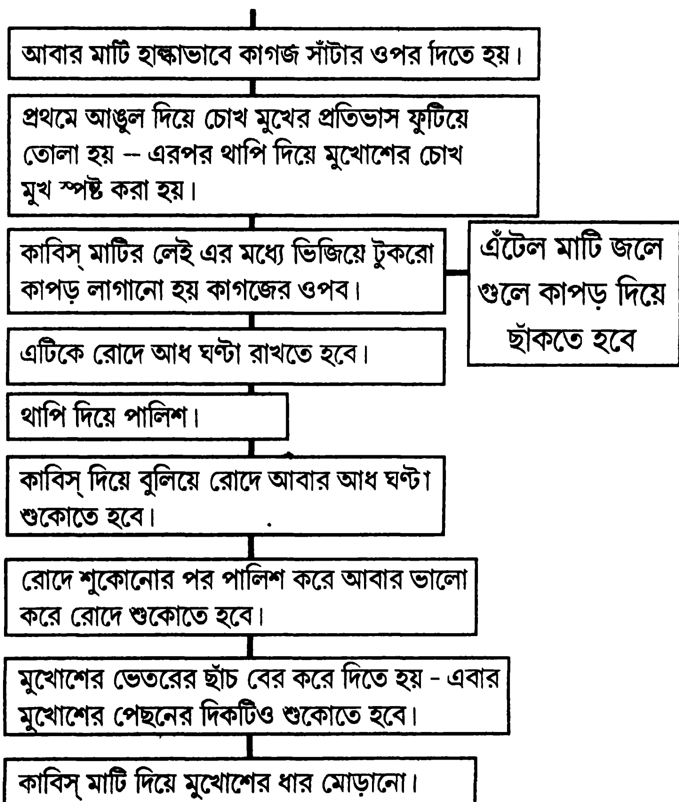
এরপরই শুকিয়ে আসা কাগজের উপরেই নরম মোলায়েম মাটির আস্তরণ লাগিয়ে মুখোশের প্রার্থিত আদলের রূপায়ণ শুরু হয়। এই পর্যায়ে মাটি দিয়েই চোখ-চোখের চাউনি, ভুরু -ভুরুর ভঙ্গিমা, নাকের পাতা, নাসিকা, ঠোঁটের বাঁকা ভাব, গালের ভঙ্গী, থুতনির খাঁজ, ক্রোধান্বিত মুখের প্রয়োজনীয় রেখা ও খাঁজ সব নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করা হয়। তার পরেই পাতলা কাপড়ের টুকরোকে ক্ষীরতুল্য 'কাবিসে' চুবিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয় সমগ্র মুখোশের উপরে — চোখ, মুখ, ঠোঁট সর্বাঙ্গ ঢেকে। এই ঘষা মাজার ফলেই সমগ্র মুখমণ্ডলে আসে মসৃণতা। কাবিস মাটি তার প্রাথমিক তারল্য হারিয়ে থুপির কারুকার্য এই মসৃণতা আনতে সাহায্য করে। আগেই বলেছি এটি ছোট বড় বিভিন্ন আকারের হয়। সূক্ষ্ম রেখা টানতেঅপেক্ষাকৃত ছোটটি ব্যবহৃত হয়। এগুলো যে কাঠের তৈরী হয় তার নাম 'কুচড়ি' কাষ্ঠ'। এ কাঠের তৈরী জিনিসে খুব বেশী মসৃণতা পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য যে থুপির নিজস্ব মসৃণতার জন্য মুখোশে মসৃণতা আসে।

থুপির কাজ শেষ হলে মুখোশকে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। সাধারণত কড়া রোদে চার-পাঁচ ঘণ্টার ব্যবধানে মুখোশটি শুকিয়ে যায় এবং ইতিমধ্যে ভিতরের মূল কাঁচামাটির ছাঁচাটিও ঈষৎ সংকুচিত হয়ে আসে ফলে মুখোশটি ছাঁচা থেকে আলগা হয়ে পড়ে, তখন মুখোশ ধরে টানলেই তা খুলে আসে। ছাঁচা থেকে খুলে আসা মুখোশটিকে আবার রোদে দেওয়া হয়।

ওদিকে দেখা যায় যে ছাঁচটি কাঁচাই আছে, একটু শক্ত হয়েছে মাত্র এবং এই ছাঁচে আবার আগের মতো আর একটি মুখোশ গড়ে নেওয়া যায়। এবং এভাবে পরপর একই ছাঁচে তিন থেকে পাঁচটি মুখোশ গড়ে নেওয়া যায় — তারপর ছাঁচটি আর কাঁচা থাকে না; ফলে সেটি মুখোশ তৈরীর অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

ছাঁচ থেকে খুলে নেওয়া মুখোশটিকে শুকিয়ে কাঁচি দিয়ে চারপাশের বাড়তি কাগজ ও ন্যাকড়ার বর্ধিত অংশ ছেঁটে কেটে কাবিসের সাহায্যে ভিতর দিকে মুড়ে প্রান্তভাগ সমান ও সুশ্রী করতে হয়। এই সময় মাথার কাছে দু-তিনটে মোটা ছিদ্র করতে হয়। যাতে নাচার সময় শিল্পীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সহজ হয়। সাধারণত এই ছিদ্রগুলো মুকুট অংশের পিছনে আড়াল করে দেওয়া হয়। এই ভাবে শেষ হয় মুখোশ তৈরীর প্রথম পর্যায়ের কাজ। এই সমগ্র ব্যাপারটিকে সংক্ষেপে ছকের সাহায্যে নিম্নরূপে দেখানো যেতে পারে —





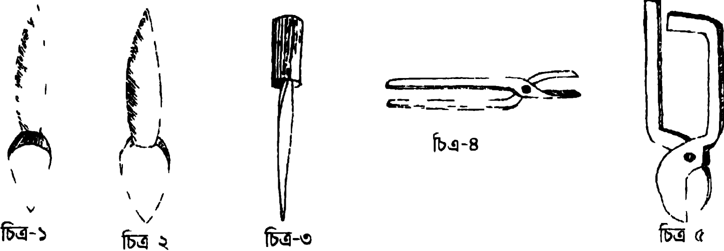
এরপরেই আসে দ্বিতীয় পর্যায়, রঙ করা ও সাজ পরানোর কাজ।

রঙের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে প্রাকৃতিক বা ভেষজ রঙ ব্যবহার করা হত। এবং রঙের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হত তেঁতুল বীচির আঠা। বর্তমানে রঙ ও সাজ-সজ্জায় রেডিমেড জিনিস ব্যবহার করা হচ্ছে।

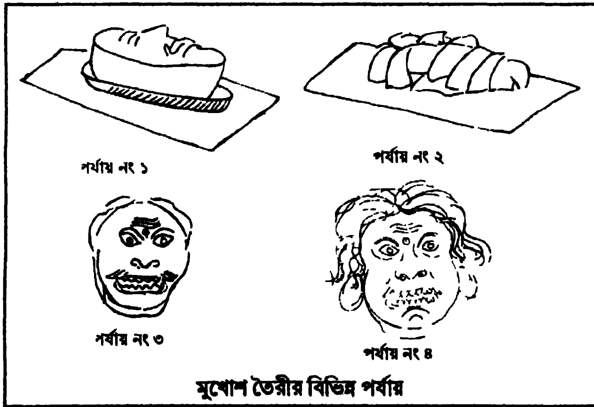
পদ্ধতিঅনুযায়ী প্রথমে খড়ি মাটি লাগিয়ে তার উপর চরিত্র অনুযায়ী রঙ লাগানো হয়। যেমন রাম বা কৃষ্ণের মুখে আকাশী নীল, মহিষাসুর বা রাবণের মুখে খয়েরী ইত্যাদি। মূলরঙ লাগানো হলে আঙুলে পরিষ্কার ন্যাকড়া জড়িয়ে দরকার মতো গুঁড়ো রং নিয়ে মুখোশের চোখের কোল, কানের গোড়া, গলার ভাঁজ, থুতনির খাঁজ প্রভৃতি অংশে 'শেড' দেওয়া হয়। তারপর হয় সরু তুলির কাজ। মূলত চোখ আঁকা, ভুরু আঁকা -- সেই সঙ্গে নাকের খাঁজটা একটু স্পষ্ট করে দেওয়া, ঝুল্‌পির সরু চুলগুলো এঁকে দেওয়া, সরু গোঁফটা এঁকে দেওয়া, কপালের টিপ, নাকের উপর নক্‌শা, চিবুকে একটি তারা ফুল ইত্যাদি -- যার যেমন দরকার তা করা হয়। সমগ্র মুখোশে রঙের ঔজ্জ্বল্য ফোটাবার জন্য দুটি পদ্ধতি

আছে। প্রথমটি পরিষ্কার নরম ন্যাকড়া আঙুলে জড়িয়ে ধীরে ধীরে মাজা। মাজতে মাজতে রং চকচকে হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়টি বার্নিশ বা গর্জন তেল লাগানো।

রঙের কাজ শেষ হলে শুরু হয় সাজের কাজ। সাজের মধ্যে প্রধান সাজ হল চুল ও মুকুট লাগানো। প্রথম চুল সম্পর্কে বলা যেতে পারে হিরাকস্ আর হরিতকী থেঁতো করে জল দিয়ে আগুনে সিদ্ধ করে চুলের কালো রং তৈরী করা হয়। তারপর শনের গুছি তাতে ডুবিয়ে রং করা হয়। শুকিয়ে গেলে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে এবং তেল দিয়ে চকচকে করা হয়। এই সব চুল তুঁতে মেশানো ময়দার ঘন আঠা দিয়ে মুখোশের সঙ্গে লাগানো হয়।



মুখোশ শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি চিত্র ১ থাপি (ছোট), চিত্র ২ থাপি (বড), চিত্র-৩ ছড চিত্র ৪ সাঁড়াশি চিত্র ৫ কাটাবি



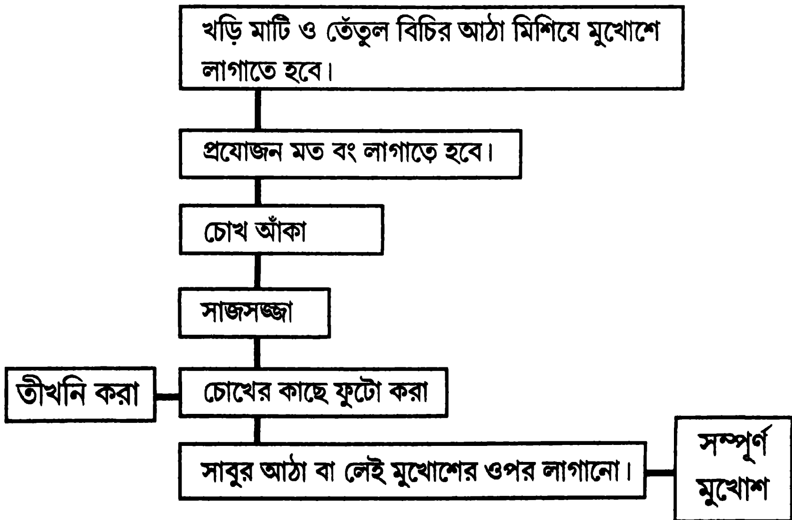
মুখোশ তৈরীর বিভিন্ন পর্যায়

সাজের মধ্যে মুকুট প্রধান। মুখোশ তৈরীর সময়েই কাগজ, মাটি-ন্যাকড়ায় মুখোশের অংশ হিসাবে ও চরিত্রের প্রয়োজনে মুকুট অংশও তৈরী হয়। কিন্তু সেটা মুকুটের কাঠামো মাত্র। রঙের কাজ হলে মুকুটে সাজ লাগানো শুরু হয়। প্রথমে আঠার সাহায্যে সমস্ত মুকুটটি সোনালী বা রুপালী চিক্ কাগজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এরপর ডানদিক থেকে বাঁদিক পর্যন্ত সারি দিয়ে 'ফেচ' লাগানো হয়। এর পরে ছোট ছোট রূপালি পুঁতি লাগানো হয়। এরপর টিকলি সারিবদ্ধভাবে লাগনো হয়। এই টিকলিগুলোর রঙ নানা রকমের হয়। এছাড়া নানা ধরনের উজ্জ্বল মালার সারি দিয়ে সাজানো হয়।

মুকুট সাজানোর প্রতি পর্বেই থাকে অতি সাবধানী তারেব বাঁধন, কারণ এই মুখোশ পরে যখন উদ্দাম নৃত্য শুরু হয তখন পদে পদেই এই বিশেষ নৃত্যকলার তীব্র ঝাঁকুনি মুকুটকে সইতে হয়। বলাবাহুল্য অতি সাবধানতা সত্ত্বেও বহু আসবে তা ভেঙে পড়ে।

মুখোশেব সাজ সম্পূর্ণ মানেই মুখোশ নির্মাণ শেষ। এবার যিনি পরবেন তার দেখার জন্য ধাবালো ছুরি দিযে ছিদ্র কবা। তবে ঐ ছিদ্র বড় কবা হয় না, কারণ তাতে মুখোশের সৌন্দর্য নষ্ট হতে পাবে। দ্বিতীয পর্যায়টিকেও ছকেব সাহয্যে নিম্নরূপভাবে দেখানো যেতে পারে --

২য পর্যায ঃ



প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণ করতে হয় লোকশিল্পকলার উদ্ভব পর্বকে। লোকশিল্পকলা উদ্ভবে প্রথমতঃ প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে ধর্ম-আচার-বিশ্বাস-যাদু। এরই পাশাপাশি কার্যকরী হয়েছে লোকায়ত সমাজের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা। কার্যকরী হয়েছে শিল্পীসমাজ ও গুণমুগ্ধ দর্শকদের নন্দন মনস্কতা। উদ্ভবের প্রাথমিক পর্যায়ে লোকশিল্পকলার সঙ্গে অর্থের যোগাযোগ ছিল সীমিত। অবশ্য কালের গতিতে এ ছবি অন্যরূপ নিয়েছে। বর্তমানে লোকশিল্পকলা প্রকটভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে অর্থের হাতছানিতে। কাজেই বর্তমান Globalization এর যুগে লোকশিল্পকলার 'বিবর্তন' বা 'Evalution' বুঝতে হলে যেমন দেখতে হবে বিবর্তিত শৈলী প্রকরণ, শিল্পবস্তুর বিষয়, ঠিক একইভাবে দেখতে হবে- ক্রমশ এরা কিভাবে 'Market Economy'র সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

নামোপাড়াতে ৫-৬টি মুখোশের দোকান রয়েছে। এখানে মুখোশ তৈরী ও বিক্রী

হয়। মুসলমান ও হিন্দু ধর্মের অন্যান্য জাতির মানুষ এই দোকান গুলোর মালিক। সূত্রধর জাতিগোষ্ঠীর মানুষ ছাড়াও এরা মুখোশের কাজ করে। এক মুখোশ ব্যবসায়ী হাফিজউদ্দীন লস্করের মতামত হল এই ব্যবসা শুরু করতে প্রায় ৩০ হাজার টাকা মূলধন লাগে। এরা পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন ছৌদল ছাড়াও কলকাতা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও বিদেশে নিজেদের শিল্পকর্ম বিপণনের বাজার তৈরি করেছে। এখানে চড়িদা, ডুমুরডিহি থেকেও প্রচুর মুখোশ বিপণনের জন্য আসে। নামোপাড়ার মুখোশের দোকান গুলোর মাধ্যমে বেচা-কেনা চলে। ফলে মুখোশ শিল্পের সঙ্গে একে একে জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন স্তরের মানুষ এবং বর্তমান 'Market Economy'।

এইসব মুখোশের দাম ২০ টাকা থেকে প্রায় ২০০০ টাকা পর্যন্ত হয়। পুরুলিয়ার বিভিন্ন ছৌদল মুখোশগুলো এদের কাছ থেকে ক্রয় করে। কাজেই চৈত্র-বৈশাখ মাসে মুখোশের কেনাকাটা বেশী। তবে অন্যান্য সময় ঘর সাজানোর জন্য যে সব মুখোশ রয়েছে তা বিক্রী হয়। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এমনকি বিদেশেও মুখোশের ব্যাপক চাহিদা দেখা দিচ্ছে। তাই পরিশেষে বলা যায় অন্যান্য লোকশিল্প যেখানে নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় হিমসিম খাচ্ছে, সেখানে এই লোকশিল্পটির চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই মুখোশ শিল্পের শিল্পীরা মোটামুটি ভাবে খুশী।

উৎস সূত্র ঃ—

১. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা (৬ইমে – ১২ই মে, ১৯৯৮) / পুরুলিয়া জেলা।
সৌজন্যে, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
তথ্যদাতার নাম : দ্বিজেন সূত্রধর (বাগমুণ্ডি)
কিশোর সূত্রধর (ঐ)
ভীম সূত্রধর (ঐ)
হাফিজউদ্দীন লস্কর (নামোপাড়া, পুরুলিয়া)

২. 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প' – তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৬।

৩. 'অসামান্য মানভূম' - তপন কর, কলিকাতা, ১৯৯৪।

৪. 'বাংলা কুটির শিল্প' - স্বপন কুমার ঘোষ, কলিকাতা, ১৯৯৬।

৫. আনন্দবাজার পত্রিকা - জেলা পরিক্রমা, ৬ই এপ্রিল, ১৯৯৯।

মাপার ঘরে সেরপাই শিল্প

"যারা বীর জাতি তারা যে কেবল লড়াই করছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করছে তারা, শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করছে ....।"[১]

বাংলার লোকশিল্পের অন্যতম বীরভূম জেলার 'সেরপাই' বা 'সুরিবোলস্' (Suribowls) শিল্প। সেরপাই বা পাই-সের একপ্রকার ওজন মাপার পাত্র। যে পাত্র শিল্পরূপে আত্মপ্রকাশ করে লোকশিল্পের ইতিহাসে কিংবদন্তী হয়েছে, এই জেলার লোকপুর গ্রামের কয়েকজন কর্মকার ব্যক্তি, কাঠ ও পিতলকে শিল্প উপাদান করে সৃজন করে চলেছেন তাঁদের সেই শিল্পকলা। শিল্পীদের নৈপুণ্য সত্যই প্রশংসারযোগ্য। গুটি কয়েক মানুষ পূর্বপুরুষের স্মৃতি বহন করার জন্য এখনও এই শিল্পকে আঁকড়ে রেখেছেন।

'Ethnicity' ও 'Identity' – এই তত্ত্বের বিচারে 'সের-পাই' শিল্প 'লোকপুর' গ্রামকে শিল্প ইতিহাসে তার 'Identity' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। মানচিত্রের নিরিখে - লোকপুর গ্রাম সদর মহকুমা সিউড়ীর খয়রাশোল থানার অন্তর্গত। সদর থেকে এই গ্রামের দূরত্ব প্রায় ৫৫ কিলোমিটার। এই অঞ্চলের আর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম 'রাজনগর' থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে।পাশে বিহারের ছোঁয়া লেগে রয়েছে। ঠিক এইরকম অবস্থানের প্রান্তিক সাংস্কৃতিক বাতাবরণে কয়েকঘর কর্মকার পরিবার লালন-পালন করে চলেছেন এই শিল্পকে।

'প্রাচীন কাল থেকে এই ধরনের লোক শিল্পীরা ছিলেন গ্রামের তথা দেশের আর্থিক বুনিয়াদ গঠনে সচেতন ও সচেষ্ট। এমনকি বর্তমানের বিশ্বায়নের যুগেও জনসমাজের আর্থিক বুনিয়াদ গঠনে তাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু বর্তমানে তারা অধিকাংশই অনগ্রসর, অসহায় এবং অবহেলিত। তবু এরা কাজ করে চলেছেন বাঁচার তাগিদে – ঐতিহ্যের আমেজে।'[২] এই কথাগুলো শাঁখারী জাতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে ইতিপূর্বে। ঠিক এইরকমই বাতাবরণ 'লোহার' বা 'কামার' জাতির ক্ষেত্রেও লক্ষিত হয়েছে। এছাড়াও পেশা ভিত্তিক জাতিগোষ্ঠীর সাম্প্রতিক অবস্থা অনুসন্ধানে ধরা পড়েছে।

প্রাচীনকাল থেকে কয়েকদশক আগে পর্যন্তও ভারতবর্ষের গ্রামগুলি ছিল স্বয়ম্ভর। একটি গ্রামের বসবাসকারী মানুষদের চাহিদা, সেই গ্রামের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত জাতির মানুষ গুলোই মেটাত। এই চিত্র আজ ভারতবর্ষের গ্রামে-গঞ্জে বিলীন হয়ে গেছে। এর কারণ হিসাবে আমাদের মনে হয় বেহিসেবি আধুনিক শিল্পায়ন ও 'Drain of Wealth' অর্থাৎ দেশীয় সম্পদের বিদেশে নির্গমন। অবশ্য এছাড়াও অন্যান্য কারণও আছে।

যাই হোক এরকম টানাপোড়েনে বৃত্তিধারী বা পেশাভিত্তিক জাতিগুলো জীবন সংগ্রাম

চালিয়ে যাচ্ছে। এবারে প্রাসঙ্গিক ভাবে বাংলা জাতিভেদের চিত্রটি কেমন ছিল দেখা যাক্। বিশেষ করে 'Division of Labour' অনুযায়ী জাতিগুলোর পরিচয় এবং অবস্থান কেমন ছিল?

"একেবারে সূচনায় বাঙলায় সমাজ সংগঠন উত্তর ভারতের আর্যসমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এটা সকলেরই জানা আছে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুপ্রবেশ বাঙলা দেশে খুব বিলম্বে ঘটেছিল। সেজন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে বাঙলায় চাতুর্বর্ণ সমাজ ছিল না; ছিল কৌম সমাজ ও বিভিন্ন বৃত্তিধারী সমাজ। বাংলার জনপদগুলি এইসব কৌম জাতির নামেই অভিহিত হত। এই সকল কৌম জাতির অন্যতম ছিল পুণ্ড্র, বঙ্গ, কর্বট প্রভৃতি। মনে হয় এই পুণ্ড্রদের বংশধররাই হচ্ছে পোদ (বর্তমান নাম পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়) জাতি। অনুরূপভাবে এটাও অনুমেয় যে, বর্তমান কৈবর্তজাতি কর্বট কৌমের বংশধর। এই সব জাতি ছাড়া প্রাচীন বাঙলায় আরো ছিল বাগদি জাতি। এছাড়া, আরও ছিল হাড়ি, ডোম, বাউরি প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষরা।"[৩]

নৃতত্ত্ববিদ ড. অতুল সুর বাঙালী জীবনের নৃতাত্ত্বিক রূপ অনুসন্ধানে একথা বলেছেন। যার সমর্থন তাঁর পূর্বের ও পরের প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস বিষয়ক গবেষণায় মিলবে। তবে মনে হয় কৌম সমাজ ও বৃত্তিধারী সমাজের পর বাঙলায় যে সমাজের উদ্ভব ঘটেছিল, তাতে জাতিভেদ প্রথা ছিলনা। সাধারণত পদাধিকার ঘটিত বৃত্তিভেদের প্রচলন ছিল। যা ঘটেছিল গুপ্তযুগে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুপ্রবেশের পর। প্রমাণ হিসেবে সমসাময়িক তাম্রপট্টে উল্লিখিত 'প্রধান কায়স্থ', 'জ্যেষ্ঠ কায়স্থ', 'প্রতিবেশী', 'কুটুম্ব' প্রভৃতি নাম উল্লেখ্য। তারপর দেখি বৃত্তিধারী বা 'Division of Labour' অনুযায়ী গোষ্ঠীর নাম, যেমন - 'নগরগোষ্ঠী', 'সার্থবাহ', 'ক্ষেত্রকার', 'ব্যাপারী' ইত্যাদি। পরে পাল যুগে যখন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ঘটে, তখন বাংলার বৃত্তিধারী গোষ্ঠীগুলো আর বৈবাহিক আদান প্রদানের ফলে গড়ে ওঠা স্বতন্ত্র সংস্থা বা 'Marriage Groups' হিসাবে থাকেনি। বিবাহ সূত্রে তখন জাতিবর্ণ নির্বিশেষে বাঙলার জাতিগুলো সঙ্করত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পালরাজাদের পরে সেন রাজাদের আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যখন পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, তখন বাঙলার সকল জাতিই সঙ্করত্ব দোষে দুষ্ট। সেজন্য 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এ বাঙলার সকল জাতিকেই সঙ্কর জাতি বলে অভিহিত করা হয়। এর আগে ঋগ্বেদ এর 'পুরুষসূক্তে' দেখি — প্রজাপতির মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে রাজন্য বা ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পদদ্বয় থেকে সৃষ্টিলাভ করে শূদ্র। এই শূদ্র জাতির পরিচয় দিতে গিয়ে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' তিনটি পর্যায় চিহ্নিত করেছে — 'উত্তম', 'মধ্যম' ও 'অধম'। এই সব পর্যায়ের উত্তম সংকর পর্যায়ে 'কর্মকার' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়।

আবার 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ'-এর মতে - বিশ্বকর্মার ঔরসে গোপক কন্যাবেশী

ঘৃতাচারীর গর্ভে যে নয় পুত্রের জন্ম হয় তাঁরা মালাকাব, কর্মকার, শঙ্খকার, কুন্দির্বক (তাঁতি), কুম্ভকার, কাংসকার, সূত্রধর, চিত্রকার ও স্বর্ণকার সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ। মধ্যযুগের ইতিহাসে বাঙলায় এই শ্রেণীবিভাগ 'নবশাখ' বিভাগ হিসেবে পরিচিত। 'নবশাখ' হচ্ছে তারা, যাদের হাতে ব্রাহ্মণরা জলগ্রহণ করে।

এছাড়াও স্মরণীয় ময়ূরভট্টের 'ধর্মপুরাণ' এ বর্ণিত বাঙালাদেশের জাতিসমূহের তালিকা —

"সদ্‌গোপ, কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বুলি।
উগ্রক্ষেত্রী, কুম্ভকার, একাদশ তিলি।।
যোগী ও আশ্বিন তাঁতী মালী মালাকার।
নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর।।
হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি।
মাজি ও বাগদী মেটে নাহি ভেদ জাতি।।
স্বর্ণকার সুবর্ণবণিক, কর্মকার।
সুত্রধর গন্ধবেনে ধীবর ও পোদ্দার।।
ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা।
পরিল তামার বালা কায়স্থ কেত্তরা।।"

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত দ্বিজহরিনামের 'চণ্ডীকাব্য' ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেও আমরা এই সকল জাতির উল্লেখ পাই। আজও এই সকল পেশাভিত্তিক জাতি এপার বাংলা ও ওপার বাংলাতে ব্যাপক ভাবে রয়েছে।

সুতরাং এতক্ষণের আলোচনায় সহজেই বোঝা যায় কর্মকার জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান প্রাচীন কালের এবং তাদের শিল্পধারাও ঐতিহ্যের আবর্তে আবর্তিত। তবে 'সের-পাই' শিল্পীদের কাজের ধারা এক্ষেত্রে একটু স্বতন্ত্র বলেই মনে হয়। কেননা কর্মকারদের শিল্প সৃজন প্রধানত লোহাকে কেন্দ্র করে। এদের মধ্যে পিতল কাঁসারও কাজ করে এমন কর্মকার মানুষও রয়েছে। এচিত্রটিও কেমন — এবার সেবিষয়ে একটু অনুসন্ধান করা যাক্।

রাঢ় বাংলার কর্মকার জাতির উদ্ভব সম্পর্কে একটি প্রচলিত কিংবদন্তীতে দেখি —

একসময় লোহাসুরের অত্যাচারে ত্রিভুবনের মানুষ জর্জরিত হয়ে পরিত্রাণের জন্য মহাদেবের শরণাপন্ন হন। দেবাদিদেব মহাদেব লোহাসুরকে বধ করার জন্য নিজের দুই বাহু

থেকে দুজন বলিষ্ঠাকার পুরুষের সৃষ্টি করেন। এই দুই পুরুষই রাঢ়ীয় অষ্টালই এবং বীরালই থাকের কর্মকারদের আদি পুরুষ। এরা মহাদেব ঠাকুরের নির্দেশ মত ঠাকুরের মাথাটিকে নেহাই রূপে ব্যবহার করে মহাদেবের ত্রিনয়নের বহ্নি দিয়ে গলিয়ে একজন বালির দ্বারা এবং অপরজন হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়ে লোহাসুরকে বধ করেন।

এ প্রসঙ্গে Watter Ruben এর নিম্ন উদ্ধৃতিটিও দ্রষ্টব্য —— "During my stay in India in 1936 - 1937. I devoted sometime to the study of my primitive tribes in Chota-Nagpur. I visited especially some villages of the 'Asur' a tribe of very primitive black-smiths on the hill of the border land of Ranchi, Jaspur and Palamou. The neighbours the higher civilized these poor-fellows and are telling a story how God (Singbonga) destroyed these Asurs by burning them in their own furnaces. Asur black-smiths are (were) a kind of devils just like the Asur of Hindu mythology. The Asur themselves told Driver (J.A.S.B at VII-1-1888) that they were burnt by God in a strong hold. With this story we may compare the famous "Tripura-daha" Siva burnt to ashes the metallic (!) the strong holds of Asurs by the fire of his third eye."[8]

কিংবদন্তী ও এ মন্তব্যটির পাশাপাশি মানিক লাল সিংহের 'রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে লিখিত অনুসন্ধানমূলক তথ্যও 'কামার' জাতির বিভিন্ন থাক পরিচয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এখান থেকে ভৌগোলিক ও কালিক হিসেবের অবস্থানে ঐতিহ্যময় সের-পাই শিল্পীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করা যাবে। তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ —

"ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কোথাও লোহার জাতি,
কোথাও কোথাও লোহার এবং কামার পাশাপাশি
আবার কোথাও কোথাও কামার জাতির বসবাস
রহিয়াছে। রাঢ়ের উপকণ্ঠে এবং দক্ষিণ রাঢ়ের
এবং দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত বাঁকুড়া জেলায় লোহার
এবং কামার জাতির বসবাস দেখা যায়। ময়ূরভঞ্জের
অন্তর্গত কুলিয়ানাতে রাণা কামারদের বসতি
রহিয়াছে। আবার বর্ধমান জেলার অন্তর্গত
আসানসোল, কুলটি, বরাকর অঞ্চলে কুলটি কামারদের

বসবাস দেখা যায়। রাঁচি জেলার তামার
অঞ্চলে কিছু উপজাতীয় গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ রহিয়াছে
যাহারা তামার তৈজসপত্র নির্মাণ করিয়া থাকে।
ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত কুলিয়ানার রাণা কামারগণ লষ্ট
ওয়াক্স্ (Lost Wax) পদ্ধতিতে পিতলের নানান বস্তু
প্রস্তুত করিয়া থাকেন। অনুরূপ পদ্ধতিতে বাঁকুড়া
জেলার ঢকরা-কামারগণ লক্ষ্মীর সাজ করিয়া
থাকেন। ঢকরা-কামারদের অপর একটি উল্লেখযোগ্য
শিল্পনিদর্শন ধান্য বা অন্যান্য শস্য এবং দুধ, ঘি,
তেল ইত্যাদি মাপিবার কাজে ব্যবহৃত পাই (কুন্‌কে),
কনা, চৌটি, মৌটি ইত্যদি।"[৫]

তাঁর কাজের অনুসন্ধানের সূত্রে রাঢ়বাংলার কর্মকার বা কামার জাতির প্রধানত চারটি থাক দেখা যায় -- ঢকরা, রাণা, অষ্টলই, বিরালই। এর মধ্যে অষ্টলই কামাররা তামা, পিতল এবং কাঁসার তৈজসপত্র নির্মাণ করেন। প্রথমে এরা পিতলের কাজ করতেন, পরে কাঁসার কাজ শুরু করেন। কাঁসা নির্মিত সৌকর্যময় শিল্পসামগ্রী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এমনকি ভারতবর্ষের বাইরেও রপ্তানী হত। এই সূত্রে আমাদের মনে হয় বীরভূমের সেরপাই শিল্পীরা অষ্টলই কামার গোষ্ঠীর অন্তর্গত। তবে এই কামারদের অন্যান্য থাকের নির্দিষ্ট কাজও করতে দেখা যায়। এছাড়া উপরোক্ত বক্তব্যে দেখলাম 'ঢকরা কামারগণ' ধান্য বা অন্যান্য শস্য মাপার জন্য পাই বা কুনকে তৈরী করত। কাজেই নির্দিষ্ট ভাবে লোকপুরের শিল্পীদের চিহ্নিত করলে কর্মের রীতির ভিত্তিতে সামান্য বিতর্ক থেকেই যায়। আবার সব থাকের সংকর গোষ্ঠীও হতে পারে। এর প্রভাবই বেশী বলে মনে হয়েছে লোকপুরের সের-পাই শিল্পী শ্রীকার্তিক কর্মকারের কাজে ক্ষেত্রসমীক্ষার অনুষঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সময়ে। সবই ব্যাপক গবেষণা সাপেক্ষ।

ইতিহাসত অনেক ঘাটলাম। এবার লোকপুরের কার্ত্তিক কর্মকারের কথায় আসি। 'সের-পাই' এর কাজ করে কার্ত্তিক বাবুও কিংবদন্তী হতে চলেছেন। কর্মজীবনে তিনি বহু পুরস্কার ও খ্যাতি পেয়েছেন এবং আগামী দিনেও পাবেন। এখানে শুধুমাত্র সরকারীভাবে পুরস্কার ও শংসার উল্লেখ করছি --

১. বস্ত্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার (১৯৭৩)

২. কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পাধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কারুশিল্প প্রতিযোগিতা — "প্রথম" (১৯৭৮ - ৭৯)

৩. ঐ — "বিশেষ পুরস্কার" (১৯৭৯ - ৮০)

৪. ঐ — "প্রথম" (১৯৮০ - ৮১)

৫. ঐ — "দ্বিতীয়" (১৯৮১ - ৮২)

৬. ঐ — "প্রথম" (১৯৮৬ -৮৭)

৭. Ministry of Textiles, Govt. of India.
Certificate of Merit (1987)
Subject : Brass and Bell Metal.

চৌদ্দ বছর বয়স থেকে বাবা, কাকা ও দাদুর কাছ থেকে কাজ শিখে আজও কার্ত্তিকবাবু তাঁর ছেলে মেয়েদের কাজ শেখাচ্ছেন এবং নিজেও করছেন। যে কাজ এই জেলার 'লোকপুর' গ্রাম ছাড়া অন্যত্র দেখা যাবেনা বললেই চলে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও নয়। তাঁর মতে এ অঞ্চলে চার-পাঁচ কর্মকার পরিবার প্রায় ছয়-সাত পুরুষ ধরে কাজ করছে। এত আনুমানিক হিসাবের কথা। তবে এঅঞ্চলে 'সের-পাই' বা 'সুরি বোলস' শিল্পকলা কত প্রাচীন তার আভাস পাওয়া যেতে পারে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Bengal District Gazetteers' এর "বীরভূম" জেলা গ্রন্থের পৃষ্ঠায় —

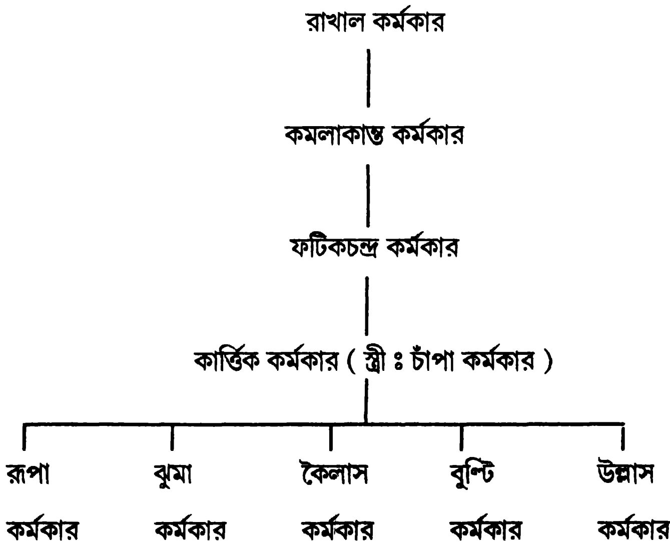
"Brass and bell metal wares of an ordinary description are made in many villages, but the braziers of Dubrajpur and Nalhati turn out articles of a better finish, which find a ready sale out side the district. The brass utensils and pots of Ilambazar, Tikarbetha and Hazratpur are also said to be of a superior quality.

One class of brass-ware has more than a local reputation, viz., what are known as Pais or Suri bowls. These are really rice measures made of wood, bound and ornamented with brass, which gives them a handsome appearance. The bowls are manufactured at Lakshmipur (generally known as Lokpur), a village in thana Khairasol about 6 miles south of Rajnagar. They are made to order, and there is a considerable

demand for them among Europeans, but as there is only one man who makes them they are not readily obtainable. They are of various sizes from 10 seers down to 1 chittack, are made in sets .... The general public use bowls of 1 seer and less for domestic purposes..."[৬]

'L.S.S. O' Malley' র উপরোক্ত বক্তব্যে তৎকালীন সময়ের 'সেরপাই বা সুরিবোলস্' শিল্প সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যায়। প্রতিভাস পাওয়া যায় -- এ শিল্পের বিশেষত্ব ও প্রাচীনত্বের। তাছাড়া জেগে ওঠে একটি প্রশ্ন সেরপাই শিল্পীরা কংসকার বা কাঁসারী না কর্মকার বা কামার জাতি গোষ্ঠীর। আর কর্মকার হলেই বা লোহার কাজের সঙ্গে সঙ্গে পিতল-কাঁসার কাজ কেন করেন? তবে জাতিগোষ্ঠীর পূর্ব ইতিহাস জেনে কার্ত্তিকবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ও তাঁর গোষ্ঠীর কাজ-কর্ম দেখে বলতেই হয় এরা কর্মকার বা কামার জাতিগোষ্ঠীর। আর তা হলে প্রশ্ন থেকেই গেল কেন এরা বৃত্তির রীতি পরিবর্তন করলেন? এ বিষয়টিও কি বৃত্তির পরিবর্তন বা "Transfer of trends"?

যাই হোক কার্ত্তিকবাবুর পূর্বের দুই-তিন পুরুষের বংশগত তালিকা তৈরি করলে -- তাদের পরিবারের অনেক প্রশংসাযোগ্য শিল্পীও খুঁজে পাওয়া যাবে —



মহিলা ও পুরুষ সবাই মিলে এক সঙ্গে কাজ করার রীতি এদের। বর্তমানেও কার্ত্তিকবাবুর পরিবারে এই রীতিরই প্রচলন রয়েছে। মেয়েরা শ্বশুর বাড়ীতে গিয়েও স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কাজ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য এদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ বা Endogamyর প্রথা রয়েছে।

এতক্ষণ শিল্পী কার্ত্তিক কর্মকাবেব সূত্রধরে 'সেরপাই' শিল্পীদের জীবনকেন্দ্রিক ও শিল্পীকেন্দ্রিক -- সামান্য কিছু তথ্য জানা গেল। এই 'Context' এ তারা কিভাবে তাদের শিল্প সৃজন করেন, সে বিষয়টি একটু পর্যায়ক্রমে দেখা যাক —

- ☐ উপাদান ঃ 'কাঠ' ও 'পিতল' সেবপাই শিল্পের প্রধান উপাদান। আম, কাঁঠাল, শিশু, শিরীষ প্রভৃতি গাছের কাঠ সংগ্রহ করে শিল্পের মূল কাঠামো গঠন কবেন। আর বাজার থেকে পিতলের পাত সংগ্রহ করে সেরপাই এর বাইরের অলংকৃত আভরণ সৃজন করেন। তাছাড়া কাঠকে রং করার জন্য প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি রংই ব্যবহার করেন শিল্পীরা। আমলা, বহেরা, হরিতকী, হীরেকষ (কষি) জলে ভিজানোব পর ফুটিয়ে কালো রং তৈরি করে কাঠের ওপর লাগান।

- ☐ যন্ত্রপাতি ঃ উগো (ফাইল), কাঠ কোঁদা মেশিন, বাশুলি (কাঠ কাটার জন্য) হাতুড়ি, লেহাই (Spiner), হাম্বার, চাঁছনা, বাটালি, হুক, ভ্রমর, কম্পাস, টুকনা, হাওয়ামেশিন, সুতরী, টানসার, লিয়াই, কুড়াল (কুটার), আকড়ো, খোলাপাটি ইত্যাদি -- এই সব সরঞ্জাম দিয়ে শিল্পীরা নিজের মত করে পর্যায়ক্রমে সেরপাই তৈরি করেন। কয়েকটি সরঞ্জামের চিত্র নিম্নে দেওয়া হল —

উগো ঃ
(পালিশ করার জন্য)



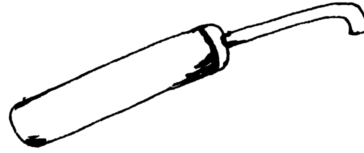
বিনা ঃ
(ফুটো করার জন্য)



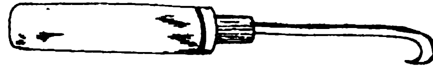
চাঁছনা ঃ
(পালিশ করার জন্য)



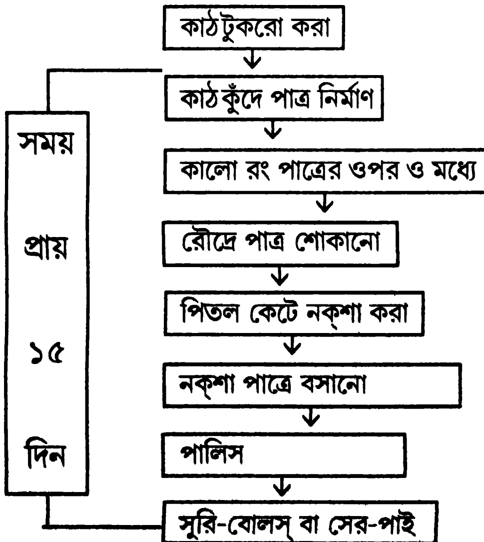
সুতরী ঃ
(পালিশ করার জন্য)



আকড়ো ঃ
(কাঠ কোঁদার কাজে)

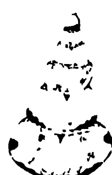


□ কাজের পদ্ধতি ঃ প্রথমে মোটা কাঠকে মাপ মত কেটে টুকরো টুকরো করেন। তারপর কাঠকে কুঁদে অনেকটা বাটির মত করে পাত্রের আকার দেন। প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাপ্ত কালো রং দিয়ে পাত্রটি রং করে রোদে শুকোতে দেন। তারপরে পিতলের পাত দিয়ে অঙ্গ সজ্জার কাজ শুরু হয়। পিতলের পাত থেকে নক্শা করে কেটে নিয়ে কাঠের পাত্রের চারপাশে ছোট ছোট পিন দিয়ে আটকিয়ে দেন। পরে বেশ কয়েকবার পালিশের পর 'সেরপাই ' বা ' সুরি-বোলস্ ' শিল্পরূপ লাভ করে। এ শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়কে সংক্ষেপে এভাবে দেখানো যেতে পারে —

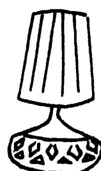


☐ নক্‌শা ও মোটিফঃ

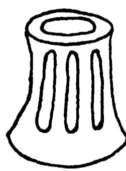
বর্তমানে পূর্বের নক্‌শার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বে সাধারণত জোড়া পায়রা, মাছ, ময়ূর ও জ্যামিতিক মোটিফ ব্যবহৃত হত। বর্তমানেও এসব মোটিফের পাশাপাশি শিল্পীর নিজের খেয়াল খুশী মত নক্‌শা সৃজন হচ্ছে -- সংযোজন হচ্ছে নতুন নতুন মোটিফের। লোকশিল্পকলায় লতাপাতার কল্কা খুবই ঐতিহ্যময় ও ব্যাপকতাময়। সের-পাই শিল্পও সেই ঐতিহ্যের বাইরে নয়। তাছাড়া শিল্পীদের চারপাশের গ্রামীণ ছবিও ধরা পড়ে তাদের শিল্পকলায়। আগে শুধু 'সেরপাই' বা সুরিবোলস্ তৈরি করতেন শিল্পীরা। বর্তমানে সেরপাই ছাড়াও একই শিল্পরীতির কৌশলে সৃজন করছেন ঘরের সৌকর্য বৃদ্ধির নানা সামগ্রী। এবং এই সব সামগ্রীতে ব্যবহৃত নক্‌শাও নতুন নতুন। শিল্পীরা ক্রমশ তাদের সৃজন কর্মের পরিধিকে বাড়ানোর চেষ্টা করছেন -- চেষ্টা করছেন তাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত সামগ্রীর ব্যাপকতা বাড়াতে, ভবিষ্যতে টিকিয়ে রাখতে। এবারে কয়েকটি নতুন নতুন সামগ্রীর আকারের পরিমাপ, নক্‌শা সহ চেহারা গুলো কেমন দেখি — (চিত্র : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬)



ঐতিহ্যময় সেরপাই



চিত্র নং : ১



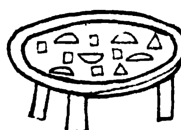
চিত্র নং : ২



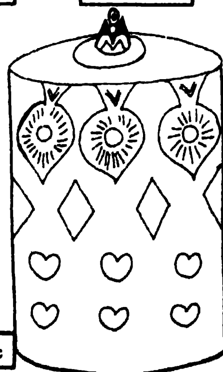
চিত্র নং : ৩



চিত্র নং : ৪



চিত্র নং : ৫



চিত্র নং : ৬

শিল্পীদের কাছে 'সুরি-বোলস' শব্দের অর্থ 'কুনকে', 'পালি' বা 'পাই'। অন্যভাবে শব্দটিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গেও অর্থ করেন 'সুরি' অর্থাৎ বীরভূম জেলার সদর 'সিউড়ি' এবং 'বোলস্' হল ছোট থেকে বড় অনুসারে সাজানো। তবে ইংরেজী অভিধানে 'Bowl' শব্দের অর্থ জানাচ্ছে 'অর্ধাকার বড় বাটি বা গামলা'। শিল্পীদের ধারণা বীরভূম জেলার কোন এক ম্যাজিস্ট্রেট এই নামটি দেন। তখন থেকেই 'সুরি-বোলস্' (Suri-bowls) নামে এ শিল্পটি খ্যাতি লাভ করে। এর পাশাপাশি শিল্পীর নিজের দেওয়া নাম 'সের-পাই' ও ব্যবহৃত হয়। যে নাম লক্ষ্মীদেবীর কুনকে বা পাই অনুসারে বা তাৎপর্যে বাঁধা।

সাম্প্রতিক সময়ে 'সুরি-বোলস্' সবচেয়ে বড় পাঁচ ফুট (5 feet) উচ্চতা সম্পন্ন হয় এবং এর চেয়ে ছোট ১ ফুট মাপেরও সেট তৈরি করা হয়। যার দাম বিভিন্ন সেট ও উচ্চতা অনুসারে বিভিন্ন। কোন কোন সেরপাই সেট দিয়ে এক মন বা প্রায় ৪০ কেজি থেকে ১ ছটাক পর্যন্ত মাপা যায়, আবার ১০ সের বা প্রায় ১০ কেজি থেকে ১ ছটাক পর্যন্তও মাপা যায়। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ বিষয়টি কেমন ছিল তা L. S. S. O' Malley এর বিবরণে দেখি —

"They are various sizes, from 10 seers down to 1 chittack, and are made in sets. A set of eight bowls from 5 seers to 1 chittack costs Rs. 46; a set of seven bowls from 5 seers to 1 chittack costs Rs. 31; a set from 2.5 seers downwards (six bowls) cost Rs. 19; and a set from 1 seer downwards (five bowls) costs Rs. 11. The general public use bowls of 1 seer and less for domestic purposes." [৭]

সুতরাং উপরোক্ত বিবরণ পরিক্রমা করে দেখা যাচ্ছে পূর্বে ১০ সের থেকে ১ ছটাক মাপার জন্য ৮টি পাত্রের সেট বা ৭টি পাত্রের সেট বা ৫টি পাত্রের সেট তৈরি হত। এখন অবশ্য ১ মন থেকে ১ ছটাক পর্যন্ত মাপার জন্য ১২টি পাত্রের সেট * (টেবিল নং : ১ ও ২) তৈরী হচ্ছে এবং কর্ম সংখ্যার পাত্রের সেটও তৈরি হচ্ছে। তাছাড়া ঘরে সাজিয়ে রাখার জন্য 'Show Piece' হিসেবে ছোট করে পাঁচটি পাত্রের 'সেট'ও প্রচুর তৈরি হচ্ছে চাহিদা অনুযায়ী। কাজেই এ শিল্পের চিত্রটা কালের প্রবাহে অনেকটাই বদলে গেছে।

*** ১২টি পাত্রের সেট ঃ (টেবিল নং : ১)**

১ মন > .৫ মন > ১০ সের > ৫ সের > ২.৫ সের >

১ সের > ১ পাই > .৫ পাই > ১ পোয়া >

.৫ পোয়া > ১ ছটাক > ঢাকনা

(টেবিল নং - ২)

পাত্রের সংখ্যা	মূল্য	মাপের পরিধি
১২টি পাত্রের সেট	৭০০০.০০ টাকা	১ মন
১০টি পাত্রের সেট	৩০০০.০০ টাকা	.৫ মন
৭টি পাত্রের সেট	৭০০.০০-৬৫০.০০ টাকা	১০ সের
৫টি পাত্রের সেট	৩০০.০০ টাকা	৫ সের

Taboo (নিষেধাজ্ঞা) ঃ প্রতিটি পেশাগত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পেশাভিত্তিক কিছু বাধা নিষেধ বা 'Taboo'র প্রচলন রয়েছে। এদের মধ্যে যেমন তিন ধরনেব ট্যাবু প্রচলিত—

১. রবিবার মূলধাতু অর্থাৎ 'তামা' গলানো নিষিদ্ধ। পিতল গলানোতেও একইরকম বাধা নিষেধ রয়েছে -- তবে তেমন ভাবে কার্যকরী নয়। এ ধরনের বাধানিষেধের প্রচলিত বিশ্বাস হল -- রবিবার তামা গলালে মহাপাপ হয় এবং সূর্যদেবতাকে অপমান করা হয়। উক্ত পাপের ফলে পাপী ব্যক্তি কুষ্ঠ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়।

২. হস্তী লক্ষ্মীদেবী এবং বিশ্বকর্মার বাহন। কর্মকার জাতির কুলদেবী লক্ষ্মী এবং জাতিদেবতা বিশ্বকর্মা তাই কর্মকার জাতির মানুষ কখনো হাতীতে চড়বেন না। বিশ্বকর্মা পূজার দিন দরিদ্র পরিবারের লোকেরা ঘটে-পটে বিশ্বকর্মার পূজা করেন। অথবা সামর্থ্য থাকলে প্রতিমা পূজা করেন। এসময়ে কাজ বন্ধ থাকে। সমস্ত সরঞ্জাম দেবতার সামনে রেখে পূজা করা হয়।

৩. শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসা পূজার দিন তাদের সমস্ত রকম কাজ বন্ধ রাখেন। অনেকেই মনসা দেবীকে আরাধনা করেন। রাঢ় বাংলাতে মনসা দেবীর উপাসনার প্রভাব ব্যাপক। যার জন্য পূজার সময়ে রাঢ়বঙ্গের গৃহে গৃহে ক্ষীরপিঠের আয়োজন হয়। এ অঞ্চলের জনমানসের বিশ্বাস 'মা মনসা'র জন্ম ক্ষীরসমুদ্রে বা ক্ষীর নদীতে। তাই রাঢ়ের মন্ত্রযানীরা দেবীর গানে বলে থাকেন — 'মাকে আনতে যাবো ক্ষীর নদীর কূলে'। তবে যে কথার বলা তা হল সেরপাই শিল্পীরাও এই ধর্মীয় আবেশের বাইরে নন। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণযোগ্য — এরা বাড়ীতে দুর্গাদেবীরও আরাধনা করেন।

☐ কর্মকার জাতিগোষ্ঠীর একটা অংশ 'সেরপাই বা সুরিবোলস্' শিল্পের কাজ করেন। জনজাতির হিসেবে তা খুবই কম সংখ্যক মানুষ এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রামে বা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। তবুও 'Ethnicity'র দিক থেকে এ'শিল্পের নান্দনিক মূল্যের পাশাপাশি ব্যবহারিক তাৎপর্যও কম নয়। প্রাচীন কালে শস্য পরিমাপের জন্য এখনকার মত 'দাড়ি-পাল্লা'র মত তেমন কোন ব্যবস্থা ছিলনা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই গ্রাম গুলোর মধ্যে 'জজমানি' প্রথা বহাল থাকত। এখনও পশ্চিমবাংলার অনেক গ্রামে বেতের 'সের' - 'কাঠা' 'ধামা' দিয়ে শস্য পরিমাপ করা হয়। সেরপাই শিল্পীদের মতে তাদের তৈরি পাই দিয়ে এখনো শস্য, বিশেষ করে চাল পরিমাপের কাজ সারা হয়। পরিমাপের ঘরে শিল্পের নান্দনিকতা অনুপ্রবেশের কৃতিত্ব লোকপুরের কর্মকার শিল্পীদেরই দিতে হয় — লোকশিল্পের সাম্রাজ্যে যা অনন্য।

কালের প্রবাহে গ্রামের তৎকালীন চিত্র অনেকটাই বদলে গেছে -- বদলে গেছে গ্রামীণ মানুষের চিন্তা ভাবনার রীতি। তাই এশিল্পের চাহিদা গ্রামের মানুষের মধ্যে তেমন ভাবে না থাকলেও -- শহরের বাজারে বেশ চাহিদা আদায় করে নিয়েছেন শিল্পীরা। এ সুযোগ তারা সরকারী বা বেসরকারীভাবে পেয়েছেন। এতসব কিছু হওয়া সত্ত্বেও খুবই অনুতাপের বিষয় নিজের জেলার মানুষ তার জেলার এ শিল্প সম্পর্কে তেমন কিছু জানেননা বা সচেতন নন।

কর্মকার পরিবারের সদস্যদের এনিয়ে অবশ্য মাথা ব্যথা নেই। তারা ভারতের বিভিন্ন বড় বড় শহরের ও বিদেশের বাজার পেতে বিশেষে আগ্রহী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে যে বড় বড় মেলার আয়োজন হয় — চান সেখানে অংশগ্রহণ করতে — বিপণন করতে চান -- সরকারী সাহায্য পেলেও এদের অবস্থা খুব একটা সুখের নয়। না - সুখ কিন্তু আছে এক জায়গায় — তা তাদের কাজের নেশায়। সারা বছর কাজ করতে তাদের কোন দ্বিধা নেই। তাই তারা জীবনযাপনের পাশাপাশি নিজের শিল্পকে ঐতিহ্যের মোড়কে রেখে আরো সৌকর্য্যময় করার চেষ্টায় রয়েছেন, যে চেষ্টা পশ্চিমবাংলার লোকসংস্কৃতির গৌরবকে খর্ব করবে না, বরং নব নব ধ্যানধারণায় আরো অনেক সৌরভময় হয়ে উঠবে। তাই এপ্রসঙ্গে আলোচনা শুরুর মত রবীন্দ্রনাথের কথাতেই শেষ করতে হয় —

> "আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির আনন্দ প্রবাহ পল্লীর শুষ্ক
> চিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করুক, নানা
> দিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এই
> রূপ সৃষ্টি কেবল ধনলাভ করার অভিপ্রায়ে নয়,
> আত্মলাভ করার উদ্দেশ্যে "[৮]

দ্রষ্টব্য ঃ

১. 'পল্লীপ্রকৃতি'র অন্তর্গত শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাষণের অংশ।

২. 'লোকায়ত শিল্পের ধারায় শঙ্খশিল্প', সুজয় কুমার মণ্ডল, সেতুবন্ধন, (সম্পা: সঞ্জীব সরকার) ডিসেম্বর, ১৯৯৭ কলকাতা, পৃঃ ৫৬।

৩. 'বাঙালী জীবনের নৃতাত্ত্বিক রূপ', ড্র অতুল সুর, কলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ ৬০।

৪. "The Asur' tribe of Chota-Nagpur 'Black-Smiths' and Devils in India' Dr. Walter Ruben.

৫. 'রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি' (২য় খণ্ড), মানিকলাল সিংহ, বিষ্ণুপুর, ১৯৮২, পৃঃ ২০৫।

৬. Bengal District Gazetteers : Birbhum, L. S. S. O' Malley, West Bengal District Gazetteers, Govt. of West Bengal, Calcutta, 1996.

৭. ibid - 6.

৮. পূর্বোক্ত দ্রষ্টব্য নং ১।

ক্ষেত্রসমীক্ষা ঃ বীরভূম জেলা (১৯.২.১৯৯৯ থেকে ২৪.২.১৯৯৯)

ঃ লোকপুর

তথ্যদাতা ঃ শ্রী কার্ত্তিক কর্মকার (লোকপুর)

শ্রীমতি চাঁপা কর্মকার (ঐ)

শ্রীমান্ কৈলাস কর্মকার (ঐ)

শ্রীমান্ উজ্জ্বল রোয়ানী (গুড়কাটা)

ভারতীয় উপজাতির প্রেক্ষাপটে

জলপাইগুড়ির মেচ রমণীদের বয়নশিল্প

"বনপাহাড়ের কোলঘেঁষে স্বপ্ন-সবুজ আন্দোলিত চায়ের গালিচায় যেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অজস্র নদীর নির্ঝরণী। দক্ষিণের সমতলের প্রসারিত আঁচল যেখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে হিমগিরির পদলেখা। উপহিমালয়ের যে ভৌগোলিক অঞ্চলের ভূমিরূপ ও জৈববৈচিত্র্য যেমন অতুলনীয়, তেমনি তার জনসংস্থান-বৈচিত্র্যও তুলনাহীন। একশো চল্লিশটিরও বেশী ভাষা ও উপভাষা ব্যবহারকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাস এই এলাকায়। এখানে যেমন একদিকে বসবাস করছেন মেচ (বোড়ো), রাভা, গারো, টোটো, লেপচা, ভুটিয়া (ড্রুকপা), য়োল্মো, কাগাতে প্রভৃতি স্থানীয় জনজাতি, তেমন অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের চা-বাগান পত্তনের সূত্রে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে এসে স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়েছেন, ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, মাহালি প্রভৃতি দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর জনজাতি।"

উত্তরবঙ্গ বিভিন্ন জনজাতির মেলবন্ধন ভূমি। উপজাতির মানুষগুলোর বিচরণের ভূমি। যে ভূমিতে বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতিগুলির চেয়ে জনসংখ্যার বিচারে 'মেচ' উপজাতিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৭১ সালের লোকগণনা অনুসারে উত্তরবঙ্গে মেচ জনসংখ্যা ১০,৭২০। তবে বর্তমানে এই জনসংখ্যা স্থানীয় বিশেষজ্ঞ সুনীল পালের মতে প্রায় পঁচিশ হাজার। নৃতত্ত্বের বিচারে এরা মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতি। আবার অনেকে একটু অন্যভাবে বলেন 'টিবেটো - বার্মন' মহাজাতিগোষ্ঠীরই একটি শাখা। মেচদের বোড়ো নামে পরিচয়ের বাহুল্য বেশী। Physical Anthropology-র নিরিখে মেচদের দেহবর্ণ একটু হলদে আভাযুক্ত ফর্সা। চোখ ছোট, নাক ঠোঁট ও চোয়ালের গঠনে মঙ্গোলীয় ছাপ প্রকট। দাড়ি গোঁফ বিরল। চুলের রং কালো। দেহ সুঠাম এবং উচ্চতা মাঝারি। শারীরিক পরিচয়ের সূত্রে বলতেই হয়, মেচদের হলদে আভাযুক্ত ফর্সার পাশাপাশি, একটু তামাটে বর্ণের দেহগাত্রও লক্ষণীয়।

জেলার নাম	মেচ জনসংখ্যা
জলপাইগুড়ি	১০,৩৮৭
দার্জিলিং	২৫৩
কুচবিহার	৬৮
পঃদিনাজপুর	১২

সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে মেচ উপজাতির অবস্থানটিও দেখে নেওয়া প্রয়োজন। ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষার ব্যাপকতা, অর্থনৈতিক ও শারীরিক লক্ষণ অনুসারে ভারতীয়

উপজাতিদের বিভিন্নভাবে বিভাজন করা যায়। উপরোক্ত চারটি লক্ষণের শেষটি অর্থাৎ শারীরিক লক্ষণের বিচার পূর্বেই বলা হয়েছে। এবারে পর্যায়ক্রমে সর্বভারতীয় উপজাতির প্রেক্ষাপটে মেচ জনজাতির স্থান নির্দেশ করা যেতে পারে।

ভৌগোলিক অবস্থান বণ্টনের নিরিখে ভারতীয় উপজাতিদের চারটি প্রধান অঞ্চলে বিভাজন করা যায় —

১) হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল অর্থাৎ North-Eastern Zone।

২) মধ্যভারত অঞ্চল অর্থাৎ Central Zone।

৩) দক্ষিণভারত অঞ্চল অর্থাৎ South Zone।

৪) পশ্চিমভারত অঞ্চল অর্থাৎ West Zone।

মেচ জনজাতির অবস্থান হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল অর্থাৎ Eastern Zoneএ। যে অঞ্চলে সারা ভারতের ১১.৩৫ শতাংশ আদিবাসীর বসবাস। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে সর্বমোট ৩৮ টি উপজাতির বসবাস রয়েছে, যা এরাজ্যের সমগ্র জনগোষ্ঠীর ৫.৭ শতাংশ। ১৯৮১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে উপজাতির জনসংখ্যা ৩০,৭০,৬৭২ জন। আমাদের আলোচ্য বিষয় যখন উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে জলপাইগুড়ি জেলা, তখন এ জেলারও উপজাতির পরিসংখ্যান ও পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। পূর্বের একটি পরিসংখ্যানে আমরা দেখেছি মেচ জনজাতির সর্বাধিক বসবাস রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলাতে। এছাড়া আরো ২০টি উপজাতিরও সন্ধান এ জেলাতে মিলবে। যেমন টোটো, রাভা, গারো, লেপচা, মগ ডুকপা, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওঁরাও, লোহারা, খাড়িয়া, মাহালী, নাগেশিয়া, মালপাহাড়িয়া, কোরা কোরওয়া, আসুর, ভুটিয়া, শেরপা , কাগাতে, ইয়ালামো, টিবেটান।

'Linguistic affiliation' এর দিক থেকে সর্বভারতীয় উপজাতিকে তিনটি ভাষাগোষ্ঠীতে বিভাজন করা যায় --

১. Dravidian-Speaking tribe

২. Austric-Speaking tribe

৩. Sinno-Tibetan Language.

মেচ উপজাতির মানুষের ভাষা 'Sinno-Tibetan' ভাষা বংশের অন্তর্ভুক্ত।

অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারতীয় উপজাতির বর্গীকরণে প্রধানত ছয়টি স্তর দেখা যায়।

ক) খাদ্য অন্বেষণকারী অর্থাৎ Food-gathers and hunters।

খ) পশুপালক গোষ্ঠী অর্থাৎ Pastoral People।

গ) স্থানান্তরকারী কৃষকগোষ্ঠী অর্থাৎ Shifting Cultivators।

ঘ) স্থায়ী কৃষকগোষ্ঠী অর্থাৎ Permanent Settled Cultivators।

ঙ) মজুর অর্থাৎ Manual labouring group।

চ) হস্তশিল্পীগোষ্ঠী অর্থাৎ Craftman group।

অর্থনৈতিক বর্গীকরণের পটে মেচদের প্রথমতঃ দেখা যায় স্থানান্তরকারী কৃষকগোষ্ঠীতে অর্থাৎ এরা ছিল Shifting Cultivators। পরবর্তীকালে স্থায়ীকৃষকগোষ্ঠীতে আবদ্ধ হয়েছে। যার প্রমাণ মেলে বিমলেন্দু মজুমদারের 'আদিবাসী প্রতিবেশী' গ্রন্থে --

"প্রাচীনকালে যাযাবর চাষী জীবনই ছিল মেচদের জাতীয় চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ। 'ঝুমচাষ' ছিলো তখন তাদের অন্যতম পেশা। তখন চাষের জমির অভাব ছিলনা। একজায়গায় দুতিন বছর চাষ করতেন। তারপর আবার বেরিয়ে পড়তেন নতুন জমির উদ্দেশে। ইংরেজ আসার পর সব জমিই জরিপ করা হলো। যেগুলো বন-মহাল, ঘাস-মহাল, চা-বাগান ও জোত সম্পত্তি হিসেবে নথীভুক্ত হয়। এরফলে উপজাতির অবাধ বিচরণে বাধা পড়ে। ফলে মেচ উপজাতিদের যে সামান্য অংশ তখনও ক্ষেত্রান্তরী ঝুম চাষী ছিলেন, তারাও স্থায়ী জমিতে বসবাস করতে বাধ্য হলেন। শুরু হল তাদের স্থায়ী চাষ নির্ভর জীবন-যাত্রা।"

এছাড়াও এদের মধ্যে বর্তমানে বা পূর্বেও দেখা গেছে মজুরী খাটা ও হস্তশিল্পের প্রভাব।

মেচদের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। যার জন্য যে সব অঞ্চলে ধান চাষের প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে, সে সব অঞ্চলেই মেচদের বসতি গড়ে উঠেছে। এছাড়া ভুট্টা ও তুলোর চাষ প্রচুর পরিমাণে করতেন। বর্তমানে অবশ্য তুলোর চাষের ব্যাপকতা কমেছে। অন্যদিকে ব্যাপকতা বেড়েছে সব্জি ও পাট চাষের। এছাড়া 'এরগু গাছে'র সহায়তায় রেশম কীট চাষেরও মেচদের মধ্যে প্রচলন রয়েছে। বর্তমানে এ

'আদিবাসী প্রতিবেশী' ঃ

বি. মজুমদার

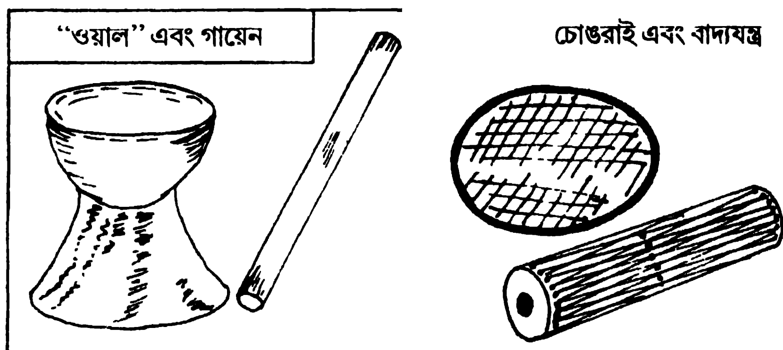
"পাহাড়টা সমতলে মেশার আগেই, আধখানা চাঁদের মতো একটা উপত্যকা নেমে এসেছে পাহাড়ের গা থেকে। দেখতে অনেকটা তাকের (সেলফ) মতো। উপত্যকার দক্ষিণ দিকটা হঠাৎ ভেঙে দেড় দুশো ফুট একটা খাড়াই সৃষ্টি করেছে। তার দক্ষিণ-পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে গেছে রং-সং নদী। ঐ উপত্যকায় ঘ-সাত্দের গ্রাম। মেচ উপজাতির গ্রাম।

গ্রামের চারিদিকে এবং রং-সং-এর সমতলে মেচরা এবার 'হাডাং' (ঝুম) চাষ করেছে। একই জমিতে মাৎ (ধান), ক্ষুম (কার্পাস) চাষ করেছে। কোন কোন জমিতে চাষ করেছে কুমড়ো, লংকা, তার সঙ্গে দুম্বা (ভুট্টা)। এবার সব হাডাং মাটি নয়া বছরী (সব নতুন জমি, প্রথম চাষ হচ্ছে। তাই এবার ফসল খুব ভালো হয়েছে।"

চায়েরও ব্যাপকতা কমেছে।

কাজেই এরকম প্রাকৃতিক ও কৃষি প্রেক্ষশপটে বয়ন শিল্পের উদ্ভব-প্রসার ঘটাই স্বাভাবিক।

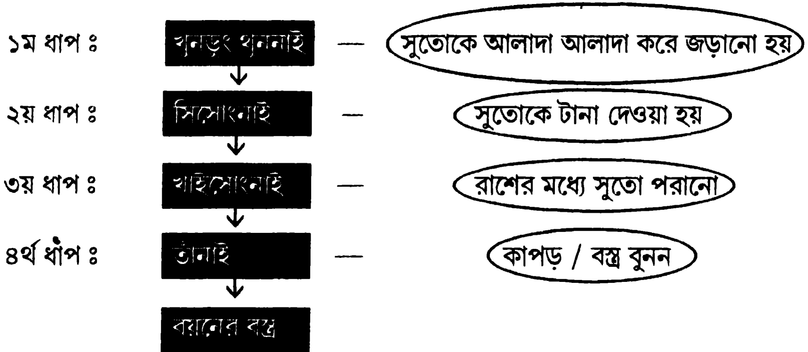
বয়ন শিল্পের কথায় আসার আগে মেচদের আরো কয়েকটি হাতের কাজের সংক্ষেপে প্রতিভাস দেওয়া যেতে পারে। বাঁশ, কাঠ, বেত, পাট প্রভৃতি উপকরণ দিয়েও এরা ব্যবহারিক ও নান্দনিক শিল্প সামগ্রী সৃজন করে। উদারহণ হিসেবে বলা যেতে পারে বাঁশের ঝুড়ি, চোঙরাই, তাঁত, কাঠের কৃষিজ সরঞ্জাম, ধানভানার 'ওয়াল' এবং 'গায়েন' ইত্যাদি। এছাড়া বাঁশ ও কাঠ দিয়ে সুদর্শন ঘরবাড়ী নির্মাণতো রয়েছেই। এরই পাশাপাশি সৃজন করে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র ও মাছ ধরার সরঞ্জাম। মেচ-হস্তশিল্পের কয়েকটি নিদর্শন --



এত গেল মেচদের অন্যান্য হাতের কাজের কথা। এবারে মেচদের বয়ন শিল্প প্রসঙ্গে আসা যাক্। মেচ রমণীরা সংসারে কাজ করে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাঁতবোনে। এ তাঁতের কাজ মেচদের বসতির সব গ্রামেই দেখা যাবে। যেমন কুমার গ্রাম ব্লকের নাড়ার থলি, পশ্চিমনাড়ার থলি, মধ্যনাড়ার থলি, পূর্বনাড়ার থলি, উত্তরনাড়ার থলি, তেলিপাড়া, পশ্চিম চ্যাংমারি, হেমাগুড়ি, ঘাঘসাপাড়া, বড় দলাদলি, কালচিনি ব্লকের কালচিনি, পশ্চিম সাঁওতালি, মধ্য সাঁওতালি, দক্ষিণ সাঁওতালি, আলিপুর দুয়ার - ২ ব্লকের মহাকালগুড়ি, তালেশ্বরগুড়ি ইত্যাদি অঞ্চলে মেচদের তাঁতের কাজ কালের প্রবাহ ধরে চলে আসছে।

মেচরা তাঁতেকে 'ছনব্যালি' বলে। নিজেরাই তৈরী করে। পূর্বে পুরোটাই বাঁশের ছিল বর্তমানে কাঠ ও লোহার পাতের 'গন্‌সা' বা নৌ এর প্রবেশ ঘটেছে। প্রচলিত তাঁত থেকে এদের তাঁত একটু আলাদা ধরনের। সব বুননই 'ডাবল্' হয়ে থাকে।

তাঁতের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন, 'ছেম্মার', 'কুতুলগন', 'মাকু', 'শালসাইখং', 'ডাণ্ডেই, 'পানজা', 'গোরাখা', 'সরকি', 'রাশের', 'খাডিনি', 'খুঁণ্টা', 'খাইটা', 'ডাংনাটা' ইত্যাদি। বস্ত্র বয়নেরও বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। যা রেখাচিত্রের আধারে ধাপের নাম সহ সমগ্র পদ্ধতিকে এভাবে দেখানো হল --



এভাবেই মেচরমণীরা বিভিন্ন কৌশলে বুননের মাধ্যমে সৃজন করে দোকনা (রমণীদের পরিধানের কাপড়), গামছা (পুরুষদের পরিধানের বস্ত্র), ফালি (মাফলার), ওড়না, গুচলা (ফতুয়া), বালিসের কভার, রুমাল, চাদর, মশারী ইত্যাদি।

নক্সা অনুসারে বিভিন্ন বুনন সামগ্রীর বিভিন্ন নাম রয়েছে। বা বিভিন্ন বুনন সামগ্রীতে বিভিন্ন ধরনের নক্সা রয়েছে, যার বিভিন্ন নাম রয়েছে।

"বস্ত্রের নাম"	"নক্সার নাম"
❑ চাদর	দিলব্রিবার, বৈরীগী, গুংরি, গোয়াল কারা ইত্যাদি।
❑ দোকনা	আগোট গুবই, ঘরিয়া আগোর, শালবিবার, বৈইগরিবিবার, খানস্লাই আগোর, খাংকারাই আগোর, খোলেশপারি আগোর, মোশাহাতাই আগোর, গোলাপবিবার আগোর ইত্যাদি।
❑ ফালি	পাহার আগোর, বুন্দরাম আগোর, মোকরদমা আগোর, লোংবিবার আগোর, মানি মনি আগোর ইত্যাদি।
❑ ওড়না	জুংরাপাছ্‌রা।

মেচরমণী স্বর্গশ্রী নার্জীনারী (পশ্চিমনাড়ার থলি, কামাখ্যাগুলি - ১) জানালেন তাঁদের বুননে প্রধানত চার ধরনের রং এর ব্যবহারই বেশী। যেগুলি হয় - লাল (মেচভাষায় - গোজা), সাদা (গোফর), সবুজ (লাইগাং), কালো (গোছাম)। এছাড়া হলুদ রং এরও ব্যবহার রয়েছে। যে রং এর দোকনা মেচরমণীরা বিয়ের সময় পরিধান করে। মঙ্গলসূচক হিসেবে হলুদ (গুমদাওদৈ) ও কাঁচা হলুদ (গুমু গৌটাং) রং এর প্রচলন মেচরমণীদের সংস্কার ও বিশ্বাসে আবদ্ধ।

মেচরমণীরা নিজেদের প্রয়োজনেই তাঁত বোনে। বিপণনের বিষয়টি প্রায় নেই বললেই চলে। তবে কেউ যদি কোন কিছু কিনতে চায় - তাও তাদের মনগড়া দামে কিনতে পারে। বুননের পদ্ধতি ও বিপণনের জন্য মাঝে মধ্যে 'প্রশিক্ষণ শিবির' ও 'সমিতি' কার্যকরী

ভূমিকাগ্রহণ করে। তবে আজ পর্যন্ত মেচদের তাঁতের কাজের সামগ্রীর কোন স্থায়ী বিপণনের ব্যবস্থা হয়নি বলে জানালেন - খড়ডাঙ্গার দ্বারেন্দ্র ইশ্বরাড়ী।



বর্তমানে বিভিন্ন কারণে মেচদের মধ্যে কার্পাস ও রেশম চাষের ব্যাপকতা কমেছে। ফলে বুননের জন্য সুতো আনতে হচ্ছে বাজার থেকে। আবার প্রয়োজনে বুননের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে কাশ্মীরী বা বিভিন্ন ধরনের 'উলের সুতো'। যার এক কিলোগ্রামের দাম প্রায় ২২০ টাকা। এবং কার্পাস সুতো 'মোটা' হিসেবে কিনে আনছে প্রায় ১০ টাকা করে। কাজেই অর্থের অভাবে অনেকের তাঁত প্রায় সময়ই বন্ধ থাকে বা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। এই বন্ধ হওয়ার পেছনে বা মেচদের তাঁতের কাজের ব্যাপকতা কমে আসার পেছনে - মেচদের নিজেদের পোষাকের প্রতি টান কমে আসারও বিষয়টি রয়েছে। এক্ষেত্রে জায়গা করে নিয়েছে মিলে তৈরি আধুনিক বস্ত্র।

তাই, বর্তমান আর্থ-সামাজিক - সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে মেচরমণীদের বয়নশিল্প ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে তাঁদের নিজস্ব বয়নরীতির দক্ষতা। কাজেই এ সময়ে প্রয়োজন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে নানা ধরনের সহায়তা। যে সহায়তার মাধ্যমে মেচরা খুঁজে পাবে পর্যাপ্ত কাঁচামাল ও উৎপাদিত বস্ত্রের বিপণন ব্যবস্থা।

উৎসসূত্র ঃ ১. **ক্ষেত্র সমীক্ষা ঃ** (ক) পশ্চিমনাড়ারথলি, কামাখ্যাগুড়ি - ১ নং অঞ্চল

(খ) খড়ডাঙ্গা, ব্লক কুমারগ্রাম।

তথ্যদাতা ঃ স্বর্গশ্রী নার্জীনারী, নির্মলা কার্জী, বলেন্দ্র বোড়ো, দ্বারেন্দ্র ঈশ্বরাড়ী ও সুনীল পাল।

২. আদিবাসী প্রতিবেশী ঃ বিমলেন্দু মজুমদার, সৌরভ প্রকাশনী, ১৯৯৭।

৩. নৃবিজ্ঞান পরিচয় (২য় খণ্ড) ঃ ড. আর. এম. সরকার, ১৯৯৩।

৪. Introducing Social and Cultural Anthropology : Hemendra Nath Banerjee, Calcutta 1990.

লেপচা জনজাতির লোকশিল্প

"Lepcha, Rong, Khamba, Mon a Mongolian tribe of Sikkim, Western Bhutan, Eastern Nepal and Darjiling. They are divided into two branches – Rong and Khamba. The former claim to be the original inhabitants of Sikkim, while the Khamba are believed to have immigrated some 250 years ago from the kham province of China, whether a deputation of Lamas had been sent to choose a ruler for Sikkim. The Raja selected by them brought with him a member of his own tribe, who retained the name of their original home as associating them with the ruling family. The distinction, however, has not operated as a bar to intermarriage, and the two branches are now thoroughly amalgamated. Both, in fact probably come of the same original stock, and represent two successive migrations of Mongols into Sikkim."[১]

১৮৯১ - ৯২ সালে প্রকাশিত হার্বার্ট হোপ রিজলের (H. H. Risley) 'The Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থের লেপচা সম্বন্ধীয় কথাগুলো দিয়েই আলোচ্য প্রবন্ধ শুরু করা হল। কারণ তাঁর বিবরণের সূত্রেই খুঁজে পাওয়া যাবে একটা শতাব্দীর হেরফেরে একটি জনজাতির বিবর্তনের রূপরেখা। কাজেই এ প্রবন্ধে আলোচনা সূত্রে একাধিকবার পূর্বের অনুসন্ধান সম্পৃক্ত গবেষণাধর্মী গ্রন্থের মূল্যবান বক্তব্যও তুলে ধরতে হয়। এরই পাশাপাশি সাম্প্রতিক ক্ষেত্রসমীক্ষার সুবাদে প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যবেক্ষণের অনুভবও দেখানো হবে। বলাবাহুল্য, এই পর্যবেক্ষণের সীমারেখা লেপচা জনজাতির সমগ্র জীবনচর্যা ও চর্চাতে বিচরণ করবে না। শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত লেপচা জনজাতির প্রতিভাসের আলোকে তাদের শিল্পকলাকে চিহ্নিত করবে।

সারল্য, ঔদার্য ও ধর্মপরায়ণতা সিকিম ও দার্জিলিং এর লেপচা জনজাতির মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অনাবিল প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যই সম্ভবত এদেরকে এত মানবিক করেছে। বিশেষতঃ 'বস্তী' বা গ্রামাঞ্চলের মানুষগুলোকে দেখলে মনে হবে যেন এক পরম বিশ্বাসের ছবি আঁকা রয়েছে এখানকার লেপচা মানুষের মুখে মুখে। তথাকথিত আধুনিক সভ্য শিক্ষিত সমাজের বুদ্ধিবৃত্তির জটিলতা এদেরকে এখনো পুরোপুরি গ্রাস করতে পারেনি। জীবনের প্রধান প্রাণরস — 'খাও দাও স্ফূর্তি কর'।

এ শুধু কথার কথা নয়। মায়া দেখানো নয়, মায়া আদায় করে নেওয়া, যা শৈলভূমি

দার্জিলিং এর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত জুড়ে বসবাসকারী লেপচা জনজাতির অন্তর খোলা মানুষগুলোর সঙ্গে মেলামেশার অনুষঙ্গেই অনুভব করা যায়। তারা সকলকে মায়ার জালে আবদ্ধ করে এবং অভ্যর্থনা জানায় — 'তাসী ডেলে, তাসী ডেলে' — স্বাগতম, স্বাগতম।

দুগে লেপচা — যার সূত্রধরেই আমাদের লেপচা মানব-মানবীর সংস্কৃতিকে সমীক্ষা অভিযান শুরু। তিনি অল ইণ্ডিয়া লেপচা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। তাঁর ও তাঁদের সহকর্মীদের একান্ত অনুরাগই আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে জানতে অনুপ্রাণিত করে এবং তারাও তাদের সবকিছুকে জানাতে চায় — তুলে ধরতে চায়। তাঁকে পাথেয় করে আমরা দার্জিলিং এর পাহাড়ের বুক চিরে যে রাস্তা এঁকে বেঁকে চলেছে — সেই পথ ধরেই রিমবিকের বুম্বাডারা গ্রাম থেকে শুরু করে অনেক গ্রামেই যাই। প্রসঙ্গক্রমে বুম্বাডারা গ্রামের সুকমিত লেপচার নাম করতেই হয়। তাঁর বাড়ীকে কেন্দ্র করে আশেপাশের দূর-দুরান্তের গ্রামের মানুষের প্রাণের স্পন্দন আমাদেরকে ফিরে ফিরে লজ্জা দেয়। বহুদূরে সূর্যকরোজ্জ্বল কাঞ্চনজঙ্ঘার কিরীটি, অর্কিডের কর্ণভূষণ, কণ্ঠে বিচিত্র বর্ণের পুষ্পমালিকা, সিড়ি ক্ষেতের ডুরে কাটা অঙ্গাভরণ এলাচী সৌরভমাখা, চরণ যুগল ঘিরে নূপুরের নিক্কণ তুলে বয়ে চলেছে তিস্তা, মেচী, রঙ্গীত — এই অপরূপ রূপে একাকার হয়ে রয়েছে লেপচা জনজাতির হার্দিক দ্যুতি।

তাদের আতিথেয়তা, নিজেদেরকে উজাড় করে দেওয়া এবং সর্বোপরি নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন — সত্যিই অবাক করে। লেপচা মানুষগুলো সম্পর্কে এসব কথা শুধু কাব্য করা নয় — শিক্ষা নেওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর রেশ ধরেই আবার পূর্বের কথায় ফিরে আসা যাক।

দার্জিলিং জেলা গড়ে ওঠার সময় বা কিছু পূর্বে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে লেপচা জনজাতির বসবাস ছিল। এরাই এখানকার আদি অধিবাসী। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন ১২ বা ১৩ শতাব্দীতে এরা পূর্বদিকে সিকিম এবং সেখান থেকে দার্জিলিংয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। গত আদমসুমারি অনুসারে তাদের জনসংখ্যা ২২,৭৪৯ জন। তবে দুগে লেপচার ধারণা এ সংখ্যা ৮০ হাজার হবে। সবই নির্দিষ্ট সমীক্ষা সাপেক্ষ।

লেপচারা মনে করে তারা 'খাঙ - চে - জো - ঙ্গা' বা কাঞ্চনজঙ্ঘার সন্তান। এ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস রসে জারিত কাহিনী অথবা কিংবদন্তীর প্রচলন রয়েছে। যেমন, কাঞ্চনজঙ্ঘার ঠিক পিছনে অবস্থিত এক গোপন উপত্যকায় সাতজন মানবের এক পরিবার ছিল। এই সাতজন মানবই পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির জন্মদাতা।

'লেপচা' নামের উদ্ভবেও নানা জনের নানা মত রয়েছে। অনেকে মনে করেন 'লেপচা' শব্দটি 'লাপ-চো' শব্দের অপভ্রংশ। এই শব্দের অর্থ স্তূপ বা পূজার বেদী।

লেপচাদের মধ্যে পাথর বা মাটির বেদী তৈরী করে তার উপরে পশুপাখী বলি দিয়ে পূজা করার রীতি থেকেই এ ধারণার উদ্ভব। গবেষক ষ্টক মনে করেন 'লাপ-চা' শব্দ থেকেই লেপচা নামের উৎপত্তি। যার অর্থ দুর্বোধ্য ভাষা অর্থাৎ Lap – Speech এবং Cha – unitelligible, অনেক গবেষক এবং লেপচা জাতির মানুষের অনেকেই মনে করেন 'লাপচা' শব্দ নেপাল থেকে আগত নেওয়ার, লিম্বু ও অন্যান্য জনজাতিদের প্রভাবে 'লাপ-চে' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশদের দ্বারা লাপ-চে শব্দের 'Distortion' ঘটে 'লেপচা' হয়েছে। অবশ্যই তাদের উচ্চারণের সুবিধার্থে। বলাবাহুল্য এখনও অনেক বস্তী বা গ্রামে নেপালী ও অন্যান্য জনজাতির মধ্যে 'লাপ-চে' উচ্চারণের চল রয়েছে। এখন লেপচারাও নিজেদেরকে লেপচা জাতি বলে পরিচয় দেয় এবং ভাষাকেও দাবী করে লেপচা ভাষা নামে। এই সূত্রে অপর্ণা ভট্টাচার্যের কথা তুলে ধরা যায় —

> " লেপচারা নিজেদের ' রোঙ - পা ' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। 'রোঙ' শব্দের অর্থ সুউচ্চ স্থানের অধিবাসী এবং এর অপর একটি অর্থে 'দাঁড়কাক' বোঝানো হয়ে থাকে। অধিকাংশ আদিবাসীদের মধ্যে যেমন পশুপাখীদের নামে নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত করার (Totem) রীতি দেখা যায়, লেপচারা তেমনি দাঁড়কাক সম্প্রদায়ভুক্ত (Ravene Folk) বলে নিজেদের চিহ্নিত করে। তাই লেপচাদের নামকরণ করা বহু শব্দের আগে এই রোঙ শব্দটি সংযোজিত রয়েছে দেখা যায়, যেমনি 'রোঙ-লী' (একটি স্থানের নাম), 'রোঙ-নীয়', 'রোঙ-নীত' (তিস্তা ও রঙ্গীত নদীর লেপচা নাম) ইত্যাদি। তিব্বতীদের কাছে লেপচারা 'মোন রী' বা 'মোন-পা' নামে পরিচিত।"[২]

এছাড়া তাঁর অনুসন্ধান কর্মের সূত্রে আরো জানা যায় —

> " লেপচাদের মধ্যে তিনটি বর্ণ বা সম্প্রদায় আছে, যেমন 'সেঙ - দেঙ - মো', 'লিঙ - সোম - মো' ও 'হী - মো'। এই তিনটি বর্ণ সম্মিলিত ভাবে 'কারথক' গোষ্ঠীরূপে এবং পূর্বপুরুষ 'থেকংসালাঙ' এর বংশধর বলে নিজেদের দাবী করে। এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী লেপচারা সেই অঞ্চল বা স্থানের নামানুসারে নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত করেছে, যেমন রিদ - চেন - পঙ এর টারগল - মো, ইলামের নাম - চে - মো, নাম ফাঙ এর নাম - ফাঙ - মো ইত্যাদি। এই ধরনের ৩৯টি গোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়। তবে তাদের মধ্যে জাতিভেদ ও বর্ণভেদের ধারণা আমাদের তথাকথিত জাতি ও বর্ণভেদের অনুরূপ নয়। লেপচারা নিতান্তই নিজেদের এক একটি আঞ্চলিক গোষ্ঠীতে বিভাজনের উদ্দেশ্যে এইভাবে পার্থক্য করে থাকে। কিন্তু এই বর্ণভেদের কোন প্রভাব তাদের সামাজিক জীবনে কোন সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা ঘটায় না।"[৩]

বর্ণভেদের কথা যখন এলো তখন গোত্র সম্পর্কেও জানান দেওয়া যাক। আদিতে লেপচাদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রচলন ছিল, এখনও রয়েছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এপ্রথার বজ্র-আঁটুনি কমজোরি হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিকতার দিকে ঝোঁক দেখা দিচ্ছে। মাতৃতান্ত্রিকতার হিসেবে সন্তানেরা মায়ের পদবী অর্জন করে। এদের মধ্যে সাধারণত পাঁচটি গোত্র রয়েছে। যেগুলি হল —

১. 'থিক্কু - স্যালঙ'।।

২. 'স্যান - দেন্ - মু'।।

৩. 'হি - মু'।।

৪. 'লিঙ - সিঙ - মু'।।

৫. 'কথাক - মু'।।

এসবের প্রাধান্য বেশী। এসব বাদেও আরো কিছু গোত্র লক্ষিত হয় — যেগুলি প্রায় স্থানের অধিবাসী হিসেবে নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য লেপচাদের মধ্যে সমগোত্রের বিবাহপ্রথা নেই। 'চী' (নেশার পানীয়) এবং মাংস লেপচা বিবাহের আকর্ষণীয় ও প্রিয় উপাদান। লেপচাদের মধ্যে দু-ভাবে বিবাহ স্থির হয় — প্রথমত দেখা যায় ছেলেমেয়ে নিজেদের পছন্দমত পাত্র পাত্রীকে নির্বাচন করে বিবাহের জন্য এবং দ্বিতীয়ত তৃতীয়পক্ষ বা ঘটক বা 'পামী-বু'র মাধ্যমে। 'মাংগিবিহে' বলা হয় ঘটকের মাধ্যমে বিয়ের প্রথাকে। এ সম্বন্ধে H. H. Risley কি জানিয়েছেন তা দেখি। তাহলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে —

"Lepcha girls usually marry between the ages of sixteen and eighteen. Men marry later owing to the difficulty of getting together the bride-price, which ranges from Rs 40 to 100 according to the rank of the parties. The freest courtship is permitted, and sexual license before marriage is tolerated. If a girl becomes pregnant, the man is expected either to marry her or to pay some compensation to her parents for the reduction in value which she has undergone. Formal proposals of marriage are usually made to the bride's parents by 'Pibus' or go betweens acting on behalf of lover. If the proposal accepted, the 'Pibus' go to the bride's house with Rs. 5 as earnest money, and ten seers of 'marua' beer and a Tibetan scraf. An auspicious day for the marriage is then fixed by the Lamas."[৪]

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ Risley সাহেবের উনিশ শতকের প্রথম দিকের। ফলে আলোচ্য বিষয়ের রূপরেখার মধ্যে বৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যায় এইসব কথার দ্বারা। বর্তমানে অনেক অঞ্চলে বিবাহের প্রথার বাঁধন পূর্বের মত নেই। সর্বোপরি ধর্মীয় বিশ্বাসের বেড়াতেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। প্রতিটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীই সৃষ্টির প্রাথমিক লগ্ন থেকে নিজস্ব সমাজ কাঠামোর প্রথাতে আবদ্ধ ছিল এবং বর্তমানেও রয়েছে। তবে কিছু কিছু আদিবাসীদের মধ্যে তাদের নিজস্ব সমাজকাঠামোর ছাঁদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে — ঘটছে ধর্মান্তকরণ। দৃষ্টান্ত হিসেবে মেচ, রাভা, দুক্‌পা প্রভৃতি জনজাতি ছাড়াও লেপচাদের কথা বলা যায়। বর্তমানে লেপচা উপজাতির মধ্যে তিন ধরনের ধর্মসম্প্রদায় দেখা যায়। প্রথমতঃ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, দ্বিতীয়ত খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী এবং তৃতীয়ত আদি ধর্মে বিশ্বাসী। আদি ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা চোখে পড়বার মতো নয়। বলাবাহুল্য যাঁরা ধর্মান্তরিত হয়েছেন তাঁদের সমাজ জীবনে এখনো সনাতন ধর্মের ধারা প্রবাহিত। যেমন — আদি ধর্মে বিশ্বাসী লেপচারা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে পিতা জ্ঞানে পুজো করে। এ সম্পর্কে এর আগে একটি কাহিনীর কথা বলা হয়েছে। এরকমই এ সম্পর্কে আর একটি কাহিনী হল — কাঞ্চনজঙ্ঘার দুটি শৃঙ্গ থেকেই পৃথিবীতে প্রথম দুটি মানব মানবীর জন্ম হয়েছিল। তাদের বংশধারা থেকেই নাকি বর্তমান মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছে। এই বিশ্বাস লেপচা মানুষের মধ্যে একাত্ম হয়ে রয়েছে। তবে এদের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে অর্ঘ নিবেদনের প্রভাব দিনে দিনে অনেকের মধ্যে কমে আসছে — সরে আসছে তাদের নিজস্ব বিশ্বাসের জায়গা থেকে। এর কারণ হিসেবে নির্মলানন্দ সেনগুপ্তের কথা উল্লেখ্য ঃ

"দার্জিলিং জেলার তিনটি পার্বত্য মহকুমা — দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং এবং তাদের সংলগ্ন সমভূমিতে দীর্ঘকাল যাবৎ নানা জাতি, উপজাতি ও জনজাতি বসবাস করছে। আদিতে আপন আপন সংস্কৃতির ঘেরাটোপে আবদ্ধ এইসব কৌম সমাজ ছিল বিচ্ছিন্ন ও অবিমিশ্র এক একটি কৌম সংস্কৃতির ধারক। কিন্তু কাল প্রবাহে পারস্পরিক সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত এবং রক্ত সংমিশ্রণ এই আদি সংগঠন ও সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটাতে শুরু করে। প্রাচীন রীতি-নীতি, পরম্পরা এবং ঐতিহ্যের প্রতি নিষ্ঠা, চিরাচরিত অভ্যাস, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন পদ্ধতির প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি যা কিছু প্রাচীন কৌমগোষ্ঠীগুলির আভ্যন্তরীণ সংহতির সূত্র হিসাবে চিহ্নিত হত তাদেরই সংঘাত শুরু হয় ব্যাপক ধর্মান্তকরণ, বর্তমান জনসংখ্যা, প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের বিকৃতি, ক্রমোন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বহির্দেশীয় সংযোগ ইত্যাদি উদ্ভূত প্রভাবগুলির সঙ্গে। অপরপক্ষে আধুনিকতার ঘাত-প্রতিঘাত অন্য যে কোন জনসমাজের মতই এই উপজাতীয়, খন্ডজাতীয় জনসমাজগুলির সমস্যা ও সংকট এবং সম্ভাবনা ও প্রগতির নির্দ্ধারক উপাদানে পরিণত হয়েছে।"[৫]

শুধু ধর্মীয় জীবন যাপন নয়, অর্থনৈতিক অবস্থারও রূপ পাল্টেছে। সাধারণত এরা কৃষিজীবী। প্রথমে ঝুম চাষ করত, তবে বর্তমানে ধাপ চাষের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের পাশাপাশি সাবু এবং ফলের চাষও করছে। এখন এদের চাষের পদ্ধতি অনেকটাই উন্নত। পরিবারের পুরুষ মহিলা সবাই একত্রে চাষের কাজ করে। কোদ, ভুট্টা, এলাচ্ প্রভৃতি ছাড়াও নানা ধরনের সাবু উৎপাদন করছে। এর পাশাপাশি পশুপালনও তাদের জীবিকার ভূমিকা পালন করে। জীবিকা সম্পর্কে 'Journal of the Ethnological Society of London' (Vol-1, No. 2, P. 151) এ রয়েছে —

"The Lepchas are poor agriculturists, their labours in this art being confined to the careless growing of rice, Indian corn, Murwa (Sessasum Orientalis), and a few vegetables, of which the brinjal, cucumber and capsicum are the chief. Their habits are incurably erratic : they do not form permanent villages and rarely remain longer than three years in one place at the experition of which they move into a new part of the forest, sometimes near, often distant, and there go through the labour of clearing a space for a house, building a new one and prepairing the ground for a crop. The latter operations consist in cutting down the smaller trees, lopping of the branches of the large ones, which are burnt and scratching the soil with the "ban", after which, on the falling of a shower of rain, the seed is thrown in to the ground. There houses are built entirely of bamboo, raised about five feet from the ground, and thatched with the same material but a smaller species, split up."

উপরোক্ত বিবরণে দেখা যায় – লেপচারা কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করেনা। মনে করা হয়, ভুটিয়াদের তুলনায় লেপচারা কৃষি কার্যে দক্ষ – সেই জন্যই অধিকতর জমি চাষ যোগ্য করে তোলার প্রয়োজনে ভুটিয়া রাজারা লেপচাদের যাযাবর কৃষকে পরিণত করেছিল। বর্তমানে স্থায়ী বসবাসের সূত্রপাত ঘটেছে। শিকার, পশুপালন ও কৃষিকাজের মানুষ ছাড়াও অনেকে শিক্ষকতা ও সরকারী চাকরী করছেন। লেখাপড়া শিখছেন অনেকেই। তবে শিক্ষার মাধ্যম কিন্তু লেপচা ভাষা নয়, নেপালী ভাষা ও ইংরাজী ভাষায়। সিকিমে লেপচা ভাষা সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। সেখানে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্তরে লেপচা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করা যায়। অথচ নিজবাসভূম দার্জিলিং এ তাদের ভাষার চল নেই বা মর্যাদা নেই। অথচ ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন – লেপচা ভাষা বিশ্বের প্রাচীন ভাষাগুলির অন্যতম, যা তিব্বত হিমালয় গোষ্ঠীর একটি শাখা। প্রাচীন কালে এই ভাষায় অনেক ধর্মীয় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। এই ভাষার সংস্কার সাধন করে

পরিমার্জিত ও আধুনিক রূপ দিতে সাহায্য করেন সিকিমের প্রাক্তন তৃতীয় চো-গিয়াল চাগ-দর নামগিয়াল। দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত বহু উপকথা, গল্প ও কাহিনীতে লেপচা সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ। প্রাচীন লেপচা ভাষায় পাঁচটি উপাখ্যান রয়েছে —

১. মুতেণ - চি (পৌরাণিক উপাখ্যান)

২. দামব্রাজো (শস্য বিষয়ক উপাখ্যান)

৩. ফেনলোক (যুদ্ধ বিষয়ক উপাখ্যান)

৪. থালা - থাপ সুকি থাপ (প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিষয়ক উপাখ্যান)

৫. প্যাসু - লোহমা - লোহ্মা (ঐতিহাসিক বীরগাথা)

এই সব সাহিত্যে এক জীবন্ত প্রকৃতির চিত্র ফুটে উঠেছে। এ সম্পর্কে ষ্টক বলেছেন —

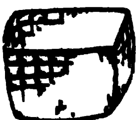
"It will be noticed that a great many of these mountains and rivers are mentioned in the Lepcha mythology and appear in the creation myths, while they are also spoken of innumerous folk tales"[৬]

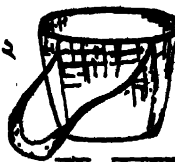
অর্থাৎ লৌকিক উপাদানে এদের সাহিত্য সমৃদ্ধ ও অনন্য। মৌখিক ভাবে প্রবাহিত ছড়া - ধাঁধা, প্রবাদ ও লোককথাও অসাধারণ তাৎপর্যময়। লেপচা জনজাতির মানুষগুলোর জীবনের নানা ক্ষেত্রের খণ্ড খণ্ড আভাসের পর তাঁদের শিল্পকর্মের রাজ্যে এবারে প্রবেশ করা যাক, যে রাজ্য তাঁদের সামাজিক - অর্থনৈতিক কাঠামোকে বেঁধে রাখে।

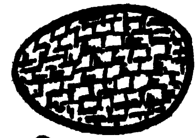
দার্জিলিং জেলা লোকশিল্পকলায় অনন্যতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। এ জেলার শিল্পকর্ম পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। এর প্রমাণ মিলবে দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সৃজনশীল কর্মের দিকে দৃষ্টি ফেরালে। এখানকার বেশীরভাগ হাতের কাজে তিব্বতের সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। কয়েকটি উপাদানের নাম না উল্লেখ করে বলা যায় বিশেষ করে এ জেলায় বসবাসকারী উপজাতি জনজাতির কারু ও চারুশিল্পের প্রায় সমগ্র আঙ্গিনাতে তিব্বতের সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপকভাবে রয়েছে। সেই প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারেনি লেপচা জনজাতির শিল্পকর্ম। ব্যবহারিক প্রয়োজন, নান্দনিকবোধ ও ধর্মীয় তাগিদে লেপচারাও সৃষ্টি করে চলেছে অসাধারণ শিল্পদ্রব্য। এসবের কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিব্বতীয় সংস্কৃতির ছাপ দেখা গেলেও 'Indigenous Art & Craft' এরও নিদর্শন কম নেই। এক্ষেত্রে বর্তমান আলোচনা তাদের প্রধান প্রধান উপাদান কেন্দ্রিক লোকশিল্পের আঙ্গিনাতে বিচরণ করবে।

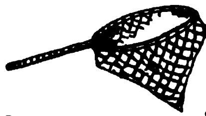
লেপচাদের বাঁশের কাজে সবচেয়ে বেশী নৈপুণ্য দেখা যায়। বাঁশকে ঘিরে তাঁদের নানা কাজের কারসাজি। বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি, ডালা, কৌটা, টুপি, বাক্স প্রভৃতি নানা ধরনের প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরী করে। সবই কৃষিকাজ ও গৃহস্থলীর কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন, কৃষিকাজের জন্য ব্যবহার করে নানা ধরনের ঝুড়ি — 'তঙগার', 'তনজঙ্গ', 'তালুঙ' 'ডালো' ইত্যাদি (চিত্র নং ১,২,৩) এছাড়া ঘরে ব্যবহার করার জন্য তৈরী করে 'ত্যকসিত্তর', 'মান্দানি', 'তুলি', 'তোনদিয়োং' 'নুরিয়াম', 'কোকরু' (চিত্র নং: ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১৩) ইত্যাদি। 'তুলি' দেখতে অনেকটা মাদুরের মত। এর ওপরে কোদো শস্য রৌদ্রে শুকায়। ' কোদো' থেকে 'চী' (উত্তেজক পানীয়) তৈরীর সময় ছাঁকার জন্য ছাঁকনীর মত 'ত্যকসিত্তর' ব্যবহার করে। 'চী' খাওয়ার জন্য বাঁশের তৈরী 'পথিয়ৎ' ব্যবহার করে। তাছাড়া দুধ থেকে মাখন নিংড়ে নেবার জন্য ব্যবহার করে 'মান্দানি'। একটি বাঁশের প্রায় তিনফুট অংশ কেটে নিয়ে একদিকে মুখ বন্ধ রাখার অবস্থা রেখে বংশখণ্ডটি নলাকার পাত্রের মত করে নেয়। এর মধ্যে দুধ দিয়ে বাঁশের আর একটি লাঠি দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লেপচা মহিলারা মাখন তৈরী করে। এরকম অজস্র সামগ্রী তাঁরা সৃজন করে তাদের জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনে। এমনকি রান্নার জন্যও বাঁশের হাতা, চামচ, ব্যবহার করে। বাঁশের কাজের মধ্যে বুননের ক্ষেত্রে লেপচা পুরুষ ও রমণীদের হাতের শৈলীকে বাহবা দিতেই হয়। এত সূক্ষ্ম কাজ খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। বাড়ী-ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রেও বাঁশের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

ঘরবাড়ি নির্মাণে কাঠেরও সহযোগিতা রয়েছে। কাঠ দিয়ে অপূর্ব বাড়ি তৈরী করে লেপচারা। কাঠের প্যানেলে খোদাই করে নানা ধরনের নক্সা ফুটিয়ে তোলে। কাঠ'কে উপাদান হিসাবে গ্রহন করে রান্নায় ব্যবহারকারী সামগ্রীও সৃজন করে যেমন 'কিউক' (চিত্র নং: ১৫, হাতার মত কাজ করে) 'গিন্টি' (দ্রষ্টব্য চিত্র নং: ১৮, কোদ ঝাড়াইএর জন্য) এবং কৃষিকার্যে ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতির সুদৃশ্য হাতল। আর একটি কাঠের তৈরী অনন্য বস্তু হল 'থ্যাপডো' (দ্রষ্টব্য চিত্র নং: ১৪)। যাকে বলা যায় 'Indigenous' ওজন মাপার সরঞ্জাম। দেড়ফুট লম্বার একদিকে বেলুনের মত ফোলা দণ্ড। যে দিকে সরু সে দিকে যা ওজন করা হবে, তা রাখার ঝোলানো (পাল্লা) পাত্র থাকে। আর দণ্ডের গায়ে বিভিন্ন দাগ কাটা থাকে। ঐ দাগের ওপর একটি ছোট দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে ওজনের হেরফের করা হয়। অর্থাৎ এক একটি দাগে দড়ি ধরলে দুদিকের সাম্যতা অনুসারে এক এক ধরনের ওজন পরিমাপ করা যায়।

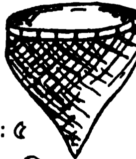

নাম : তঙগার
চিত্র নং : ১


চিত্র নং : ২
নাম : তনজঙ্গ


চিত্র নং : ৩
নাম : তালুঙ



চিত্র নং : ৪
নাম : ত্যকসিওর

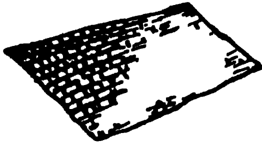


চিত্র নং : ৫
নাম : ত্যকসিওর





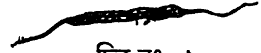
চিত্র নং : ৬
নাম : মান্দানি



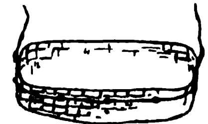
চিত্র নং : ৭
নাম : ত্তুলি



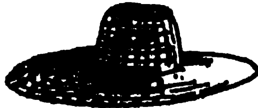
চিত্র নং : ৮
নাম : তোনদিয়োং



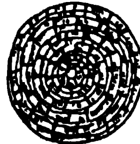
চিত্র নং : ৯
নাম : নুবিয়াম



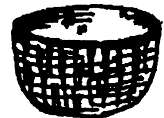
চিত্র নং : ১০ নাম : কোকরু



চিত্র নং : ১১
নাম : চুন্নি



চিত্র নং : ১২
নাম : নানবু



চিত্র নং : ১৩ নাম : ডালো

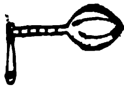
এছাড়াও লেপচারা কাঠের অন্যান্য সামগ্রীও তৈরী করে। সূক্ষ্ম কারুকার্য মণ্ডিত কাঠের আসবাব পত্র তৈরী করে, যার শিল্পসৌন্দর্য সত্যই মনোমুগ্ধকর।

লেপচা জনজাতির আর একটি চিরাচরিত লোকশিল্প হল হাতে বোনা তাঁত। তাঁতজাত বয়নশিল্পে এরা নিজেরাই স্থানীয়ভাবে নিজেদের রঙ-বেরঙের পোষাক তৈরী করেন। দার্জিলিং এর বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে হস্ত ও কুটির শিল্প সমবায় সমিতি বিভিন্ন ধরনের লোকশিল্পের সামগ্রী তৈরী করছে। আমরা আশীষ বসুর Handicrafts of West Bengal ' গ্রন্থে দেখতে পাই —

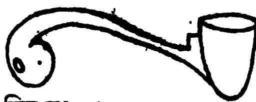
" Kalimpang Arts & Crafts indust-Co-operative Society Produces house hold lines and hand block prints like scarves and handkerchiefs, lingerie and childrenware, handmade article of Lepcha hand-weaves (hand-bags, shoulder bags etc), Pictures, wall panels and fire -screens, hand printed cards and various novelities."

কাজেই বয়নের কাজে সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সমবায়ের মাধ্যমে লোকশিল্পের অন্যান্য আঙ্গিকেরও পুনরুজ্জীবন ঘটছে লেপচাদের মধ্যে। লেপচা পুরুষদের নিজস্ব পোষাকের নাম ' ডোম্প্রা' (dompra) এবং টুপির নাম 'শ্যামথিং' (Samething) এবং মহিলাদের

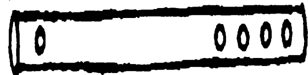
পোষাকের নাম 'গাদা' (gada)। এসবই নিজেরা নিজেদের প্রয়োজন মত বোনে, যার মধ্যে ব্যবসায়িক মনোভাবের যোগ নেই বললেই চলে।



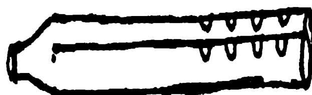
চিত্র নং : ১৪
নাম : থ্যাপডো



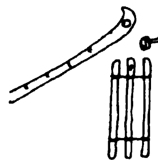
চিত্র নং : ১৫
নাম : কিউক



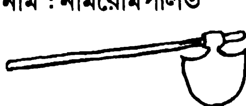
চিত্র নং : ১৬
নাম : পনডুঙ্গপলিত



চিত্র নং : ১৭
নাম : নামরোমপলিত



চিত্র নং : ১৮
নাম : গিল্টি

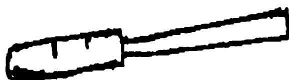


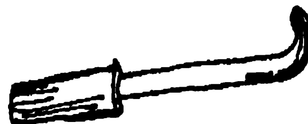
চিত্র নং : ১৯
নাম : তাকচু





চিত্র নং : ২০
নাম : পৌক





চিত্র নং : ২১
নাম : কেচিয়া

নাচ-গানে মত্ত থাকে লেপচারা। আর নাচ-গানের সহায়ক হিসেবে তারা তৈরি করে নানা বাদ্যযন্ত্র। যেমন, দুধরনের বাঁশের বাঁশি — ক) 'পন্‌ডুংপলিত' (Pondun Polit) : চারটি ছিদ্র বিশিষ্ট এক নলের বাঁশি (দ্রষ্টব্য চিত্র নং ১৬। খ) 'নামরোমপলিত' (namrompolit) : দুটি ছিদ্র বিশিষ্ট দুটি নলের বাঁশী (দ্রষ্টব্য চিত্র নং: ১৭), নাকাড়ার মত ড্রাম, যার নাম তাঁদের ভাষায় 'ডনডার' (dondar), দোতারার মত 'টুংনা' (tunna) ইত্যাদি। এছাড়াও অন্যান্য নানাধরনের ছোট খাটো বাদ্য যন্ত্র রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে সংযোজন করতে হয় তাদের বাঁশের কাজের উপযোগী বাঁশের প্রজাতির নাম তাদের ভাষায় — মোটা বাঁশকে বলে 'মদ্‌লু' (mddlu) এবং তিনধরনের সরু বাঁশের প্রজাতির নাম পর্যায়ক্রমে — 'আগলেমপো' (aglempo), 'চৈয়া' (coia) এবং 'ট্রিপো' (cripo)। বলাবাহুল্য বাঁশকে লেপচারা 'পো' (Pou) বলে। বন্যজন্তু ও আত্মরক্ষার জন্য তীরধনুকও বাঁশ দিয়ে তৈরী

করে, যার নাম তাদের ভাষায় 'চোংসিলি' (connsili), তীরধনুক ছাড়াও লেপচারা 'ফিয়া' দিয়ে শিকার করে বিভিন্ন জীবজন্তু ও পাখী। নাতিদীর্ঘ একটুকরো দড়ির প্রান্তে একখণ্ড পাথর বেঁধে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিকারের উদ্দেশে ছুড়ে দেওয়াকে 'ফিয়া' শিকার বলে। লোকশিল্পের এই লৌকিক রীতিটি যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন।

দার্জিলিং এর কালিম্পং রেঞ্জের মধ্যে তিস্তাবাজার, রঙ্গীবাজার, সিতং, কালিঝোরা, তাকভার, সোনাদাজ প্রভৃতি এলাকায় লেপচা সম্প্রদায়ভুক্ত জনজাতিরা বিভিন্নধরনের পশু পাখীর হাড় ও পালক দিয়ে নানা শিল্পবস্তু নির্মাণ করে। যেমন, জীবজন্তুর মোখা, দেবদেবীর মুখচ্ছেদ, কলমদানি, দোয়াতদানি, ফুলদানি ইত্যাদি। এছাড়া এজেলার সর্বত্র লেপচাদের তৈরী ভুট্টার উপরের পাতার মত অংশ শুকিয়ে সৃজনশীল নানান শিল্পবস্তুও দেখা যায়। যেমন, 'কুংপি' (cunpi – টুপি), 'নানবু' (nanbu – বসার জন্য গোড় পিড়ের মত) ইত্যাদি

লেপচা জনজাতির সৌন্দর্যবোধ জন্মগত। তাঁরা প্রাচীর চিত্রাঙ্কনে বিশেষভাবে পারদর্শী। দার্জিলিং এর বৌদ্ধ মঠগুলিতে যে নৈপুণ্য ফুটে উঠেছে তা অনন্য, অধরা।

সম্প্রতিককালে লেপচা জনজাতির লোকশিল্পের নিদর্শন লোকচোখের অন্তরালে ক্ষয়ে যেতে বসেছে। কেননা, এখন একেবারে নির্জন, শহর থেকে দূর-দুরান্তের বস্তিগুলো ছাড়া এসবের দর্শন মিলবে না। কালের প্রবাহে যন্ত্রমাধ্যমের ক্ষেপনে এই সব শিল্প মহিমাহীন হয়ে পড়ছে। তাছাড়া মহিমাহীনের অপর কারণ হিসাবে বলা যায়, এইসব শিল্প সামগ্রী সৃজন করে শিল্পীদের আর্থিক সচ্ছলতা তেমন ভাবে আসছে না। এই কারণে বর্তমান প্রজন্মও এই সব শিল্প সামগ্রী নির্মাণে আর তেমন উৎসাহ পাচ্ছেনা। তবে আশার কথা, বর্তমানে এদের লোকশিল্পে বাণিজ্যিকভাবে তেমন বিকাশ না ঘটলেও, তাদের নিজস্ব দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনত মেটাচ্ছে। অন্যান্য সব দিকের কথা হারিয়ে গেলেও নিজস্ব শিল্পরীতির মধ্যেই লেপচারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য বজায় রাখার নিয়ত চেষ্টা করছে। সবশেষে, লেপচাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম আকর্ষণ ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে হার্দিক টানে নিজেদের কাছাকাছি এনে একাত্ম করে নেবার দক্ষতা প্রসঙ্গে এ কথাই বার বার মনে হয় —

' তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফেরে'। — 'আ-চুলে'।।

দ্রষ্টব্য ঃ

১. 'The Tribes & Castes of Bengal' : H. H. Risley, Calcutta, 1st Edition – 1891, Reprint 1998, P. 6.

২. 'সিকিম' : অপর্ণা ভট্টাচার্য, ভারত. পৃঃ ২১।

৩. পূর্বোক্ত দ্রষ্টব্য নং ২, পৃঃ ২২।

৪. পূর্বোক্ত দ্রষ্টব্য নং ১, পৃঃ ৮।

৫. প্রবন্ধ : 'দার্জিলিং হিমালয়ের আদিবাসী লেপচা', নির্মলানন্দ সেনগুপ্ত, 'মধুপর্ণী' (দার্জিলিং সংখ্যা), সম্পা ঃ অজিতেশ ভট্টাচার্য, বালুরঘাট, ১৯৯৬।

৬. পূর্বোক্ত দ্রষ্টব্য নং ২, পৃঃ ২৫।

৭. "বাংলার কুটির শিল্প", স্বপনকুমার ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ ২৭।

৮. 'আ-চুলে' — একটি লেপচা শব্দ বিদায় সম্ভাষণের, যার অর্থ অনেকটা এইরকম — "ঈশ্বর মঙ্গল করুক"।

উৎসসূত্র ঃ

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষা : দার্জিলিং ও কালিম্পং মহকুমা, তারিখ ১৮.১১.৯৮ থেকে ২৪.১১.৯৮।

ক) তথ্যদাতার নাম ও ঠিকানা ঃ

১. দুগে লেপচা, দার্জিলিং

২. পাসাং লেপচা, দার্জিলিং

৩. এড্রিন লেপচা, দার্জিলিং

৪. রবি লেপচা, দার্জিলিং

৫. হেমন্ত লেপচা, দার্জিলিং

৬. সুকমিত লেপচা, গ্রাম বুম্বাডাঁরা, দার্জিলিং

৭. রানমান লেপচা, গ্রাম : তুবুন, দার্জিলিং

৮. বুবন লেপচা, ঐ

৯. নোরকিত লেপচা, ঐ

১০. সোঙমিত লেপচা, ঐ

১১. সানিওল লেপচা, কালিম্পং প্রমুখ।।

খ) গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার নাম ঃ

১. 'The Tribes & Castes of Bengal' : H. H. Risley, Calcutta, 1st Edition – 1891, Reprint 1998.

২. 'সিকিম', অপর্ণা ভট্টাচার্য, ভারত।

৩. 'বাংলার কুটির শিল্প', স্বপন কুমার ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯৬।

৪. "আদিবাসী প্রতিবেশী", বিমলেন্দু মজুমদার, কলকাতা, ১৯৯৭।

৫. প্রবন্ধ : (১) 'দার্জিলিং হিমালয়ের আদিবাসী লেপচা' : নির্মলানন্দ সেনগুপ্ত, (২) 'দার্জিলিং জেলার লোকশিল্প একটি আর্থ সামাজিক সমীক্ষা' : ধনঞ্জয় রায়, 'মধুপর্নী' সম্পা ঃ অজিতেশ ভট্টাচার্য, বালুরঘাট, দার্জিলিং জেলা সংখ্যা, ১৯৯৬।

তৃতীয় বলয়

মহান ব্যক্তিত্ব ও লোকসংস্কৃতি

□ চৈতন্যদেব ও লোকধর্ম।

□ রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি

চৈতন্যদেব ও লোকধর্ম

নব্যভক্তিবাদের প্রবক্তা চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলার সমাজ-জীবনে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের কাছে মুক্তিদূতরূপে। চৈতন্যদেবকে বাঙালির ধর্মমুক্তির ভগীরথ হিসাবে পেয়ে বাংলার লোকধর্মগুলো মধ্যযুগে লোকায়ত মানসে নবরূপ সঞ্চার করেছিল। মানুষগুলো পেয়েছিল নতুনভাবে বাঁচার তাগিদ। একদিকে ব্রাহ্মণের সমাজ শাসন আরেকদিকে মুসলমানদের অত্যাচার থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব উদার মানবধর্ম অবলম্বন করেন – যার নামান্তর বৈষ্ণবধর্ম। আর এই ধর্মের মতাদর্শের প্রভাবে সমান্তরাল ভাবে লোকধর্মের অন্তর্গত অনেক উপধর্ম জেগে উঠেছিল। তাই বলা যায়, বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের আবর্তনে আবর্তিত হয়েছিল বাংলার লোকধর্ম।

বাংলার লোকধর্মের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের যোগসূত্র দুদিক থেকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। একদিকে দেখা যায়, সনাতন বর্ণাশ্রম বহুল হিন্দু ধর্মের ছুৎমার্গী কাঠামো শ্রীচৈতন্যদেব ভেঙ্গে ছিলেন বলে পরবর্তীকালে একাধিক লৌকিক গৌণধর্ম জেগে উঠলো। এবং অপরদিকে দেখা যায়, পরবর্তীকালে বেশিরভাগ লোকধর্ম ব্যাখ্যা করতে লাগলো শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব তাদের নিজস্ব চিন্তার আলোকে। এ ব্যাপারটিকে লোকসংস্কৃতির গবেষক ডঃ সুধীর চক্রবর্তী সুন্দরভাবে বলেছেন –

> ‘‘এক চৈতন্যচন্দ্র আলোকিত করলেন অনেকগুলি চেতনা
> এবং সেই অনেকগুলি চেতনা উদ্‌ভাসিত করলো অনেকগুলি
> চৈতন্যমূর্তি।’’

একথার প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি লোকধর্মের সাধনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ বাউলদের কথা। এরা মনে করেন চৈতন্যদেবের শিষ্য নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রই স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের অবতার। আর তার থেকেই বাউলদের ক্রিয়া-করণের সূচনা।

দ্বিতীয়তঃ মারফতী ফকিরদের কথা। এরা মনে করেন যে আল্লা সেই রসুল, যে আল্লা সেই মহম্মদ, যে মহম্মদ সেই চৈতন্য।

তৃতীয়তঃ কর্তাভজাদের কথা। এরা মনে করেন যে কৃষ্ণ সেই চৈতন্য। সেই চৈতন্য আবার তাদের ধর্মের প্রবর্তক আউলে চাঁদই পরে সতীমা’র গর্ভে তাদের পরমারাধ্যা দুলাল চাঁদ হয়ে জন্মেছেন।

চতুর্থতঃ বলাহাড়ীদের কথা। এখানে দেখা যায়, মেহেরপুরের বলরামহাড়ী বলে একজন অন্ত্যজ মানুষ তার নিজের নামে বলরামী বা বলহাড়ী বলে এক সম্প্রদায় গড়ে ছিলেন। শিষ্যরা তাঁর প্রয়াণের পর সেই বলরামের মধ্যে চৈতন্যতত্ত্ব মিলিয়ে গান বাঁধলেন

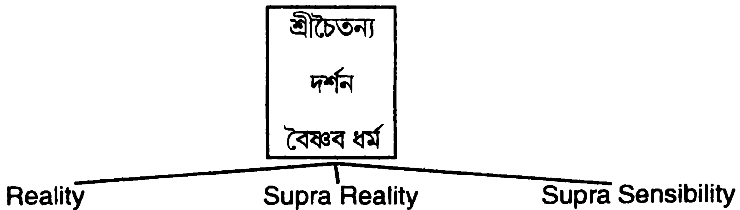
"নবদ্বীপে এসে ছিন্নবেশ
কেঁদে গেল শচীর গোরা।
কলিকালে মেহেরপুরে
পূর্ণ মানুষ দেখরে তোরা।।"

অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস — মেহেরপুরের বলরাম সেই পূর্ণ মানুষ যিনি আসলে শচীর গোরা।

এত গেল লোকধর্মের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের যোগসূত্রের কয়েকটি নমুনার কথা। তবে আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপকতা পাবে আলোচনার প্রারম্ভিক দুটি দিক পর্যালোচনার সূত্রে। তার আগে একটু তত্ত্বকথা সেরে নেওয়া যাক্।

তৎকালীন সমাজ ইতিহাসে ও ধর্মীয় জগতে চৈতন্যদেব এক অনির্দেশ্য প্রভাব ফেলেছিলেন। যার তরঙ্গাভিঘাত পড়েছিল তদানীন্তন রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাহিত্য ও ধর্মীয় জীবনে এবং অভিঘাতে উদ্বেলিত করেছিল উচ্চকোটির জনগণ অপেক্ষা নিম্নকোটির মানুষদের। এর ফলে 'Class Division' যেমন সেদিন সুস্পষ্ট হয়েছিল তেমনি 'Class Struggle'র সঙ্গে সঙ্গে 'Class Consciousness' পূর্ণমাত্রা পেয়েছিল।

সেই সময়ে চৈতন্যদেব সাম্যবাদের প্রতীক হিসাবে গৃহীত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবন দর্শন তৎকালে মানব জীবনে বা সমাজজীবনে যেভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছিল — তার 'ট্রাইকোটমি মডেল' সৃষ্টি করে ত্রিধারা রূপ দেওয়া যায় ঃ—



এক্ষেত্রে, বৈষ্ণবধর্ম-দর্শন-সাম্যবাদ ও Chaitanya Cult কে পাশাপাশি রেখে লোকধর্মের বিচরণ ক্ষেত্রের কেমনতর প্রসারণ ঘটেছিল তা বোঝা যাবে মডেলের পরের দুটিতে।

প্রসঙ্গক্রমে একইভাবে আলোকপাত করতে হয় লোকধর্ম কি? ধর্মের সঙ্গে এর যোগসূত্র কোথায় এই প্রসঙ্গে?

আদিম মানব সমাজ ভয়ভীতির জন্য নৈসর্গিক শক্তি সমূহে প্রাণারোপ করেছিল। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্য-অদৃশ্য গুলোকে প্রকাশন - ক্রমন - প্রজনন ক্রিয়ার সঙ্গে বিশ্বাস ও জাদুবিশ্বাসকে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করেছিল। আর এই বিশ্বাস ও জাদু থেকে একসময়ে নির্গত হয়েছিল ধর্মের অ্যামিবা। ধর্ম-কর্ম নিয়েই লোকাচারের আঙ্গিকের বিকাশ।

অর্থাৎ একদিকে প্রাণবাদ এবং অন্যদিকে মনোবাদ -- এই উভয় চেতনার টানাপোড়েনে ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীতে। আদিম মানুষের এই সৃষ্ট ধর্মই হাজার হাজার বছরের বহু বিবর্তিত রূপই হল লোকধর্ম।

লোকধর্মের এই পটভূমিকায় বাংলার ক্ষেত্রে আরো ব্যাপকতা আসে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে। লোকধর্মের দিগন্ত প্রসারিত হয়ে গড়ে উঠল বহু উপধর্ম বা গৌণধর্ম। যার প্রাণবীজ থাকে লৌকিক জীবনে এবং লোকায়ত যাপনে। এ ধর্মের অনীহা আছে বেদ-কোরানে, মন্দিরে-মসজিদে, মূর্তিপূজায়। তত্ত্বগত ভাবে ও বিশ্বাসে এ ধর্ম যেমন শরিয়ৎ বিরোধী তেমনি বিরোধী নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের। এরা স্পর্শ করেনা জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভেদ। এখানে সবচেয়ে বড় স্থান পায় অনুমানের চেয়ে বর্তমান, পরলোকের চেয়ে ইহলোক, ঈশ্বরের চেয়ে গুরু, আত্মার চেয়ে দেহ, মন্ত্রের চেয়ে গান। তাঁরা মেনে নেন জীবনের মূল উৎস হিসেবে — মাটি ও মানুষ, জমি ও বীজ, নারী ও নর, উর্বরতা ও প্রজনন এবং এইসব কিছুর নিয়ন্ত্রণ নিজের পরিসীমায়।

অর্থাৎ লৌকিক বিশ্বাসের বিশ্বে ভূগোলের বেড়া নেই, ধর্মের বেড়ি নেই, কেননা মানুষ তাঁদের উপাস্য। মানুষ তাঁদের সাধনভূমি —

" মানুষ হয়ে মানুষ জানো
মানুষ হয়ে মানুষ মানো
মানুষ সাধন ধন
করো সেই মানুষের অন্বেষণ। "

এই অন্বেষণেই লোকধর্মের হয়ে ওঠা। যার যোগসূত্র মিলবে চৈতন্যদেবের মানবতা বাদে -- সাম্যবাদে এবং সর্বোপরি বৈষ্ণব ধর্মে। কাজেই এবারে দেখব চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম কি বলছে, এবং সেই সঙ্গে এর উদ্ভবের শিকড়টি কোথায়? এর মাধ্যমেই খুঁজে পাওয়া যাবে আলোচ্য বিষয়ের যোগসূত্রের প্রথম দিকটি।

বাংলার ইতিহাসে দেখা যায়, তুর্কি আক্রমণের পরে বাংলার সমাজজীবনে ও ধর্মীয়

বাতাবরণে ব্যাপক সংঘাত সৃষ্টি করে ব্রাহ্মণ ও মৌলবীরা। দেখা দিল শ্রেণী স্বার্থের অত্যাচার। শুরু হয় শূদ্র দলন। যাদের ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তি ছিল — জাতপাতের জল-অচল ভেদ ও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি। এসবকে সম্পূর্ণ বিচূর্ণ করে চৈতন্যদেব প্রতিষ্ঠা করলেন মানুষের মধ্যে সাম্য। এক নিতান্ত সহজপথ দেখিয়ে কোটি কোটি লাঞ্ছিত মানুষকে দিলেন মনুষ্যত্বের মর্যাদা। সবাইকে মিলিত করলেন অন্তরঙ্গ অনুরাগের বন্ধনে। এই মানব ধর্মের আবর্তনে বাউল কবি গাইলেন —

"গৌর, কী আইন আনিলে নদীয়ায়।

আনকা আচার আনকা বিচার

দেখে শুনে যে ভয় পায়।।"

অর্থাৎ এক আঘাতেই বিচূর্ণ করলেন পুরানো শাস্ত্রের জমাট গ্রানাইট। অবিরল অশ্রুর প্লাবনে ধুয়ে ফেললেন মুসলিম-শূদ্রের উপর স্বার্থের তাগিদে ছাপ মারা কলঙ্ক-কালিমা। তাই তিনি, পদকর্তার কথায় — 'অগতি-পতিত কুমুদ বন্ধু।' বা 'আচণ্ডালে ধরি দেই কোল।'

অপরদিকে লোকধর্মের ক্ষেত্রে দেখা যায় — সেই সময় শাস্ত্রানুমোদিত ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের মানুষের একাধিপত্য প্রকট হয়। বিশেষত ব্রাহ্মণ ও মৌলবীদের অধিকার সকলের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা দাবী করলেন ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে একমাত্র তারাই যোগসাধনকারী অনুঘটক। সমাজও এই দাবী মেনে নেয়। আর এই সুযোগে শাস্ত্রানুমোদিত ধর্মের ধারক ও বাহকেরা ধর্মের নানা অপব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন। পরিস্থিতির শিকার হলেন যে সব অসহায় মানুষ -- তারা সেই অসহায়ত্বের সুযোগ নিতে লাগলেন। ধর্মের নামে তথাকথিত ধর্মবেত্তারা শুরু করলেন শোষণ পীড়ন। এই শোষণ পীড়নে সমাজের দুর্বল শ্রেণী তথা নিম্নবর্ণীয় মানুষ মনে মনে শুদ্ধ হলেন। শেষপর্যন্ত শোষিত পীড়িত মানুষ তথা অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত মানুষদের মধ্যে মুখপাত্র স্বরূপ প্রতিষ্ঠা পেল নানা উপধর্ম। এদিক থেকে আমরা বলতে পারি লোকধর্মের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল — প্রতিবাদ।

লোকধর্ম অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। তথাকথিত ধর্মধ্বজীদের মুখোস খুলে দিয়েছে। আর সেই সঙ্গে কি কর্তাভজা, কি বলাহাড়ী, কি সাহেবধনী — সব ক্ষেত্রেই এই সব ধর্মের প্রবর্তকগণ অভিন্নতা প্রকাশ করেছেন নিজেদের সঙ্গে চৈতন্যদেবের। অর্থাৎ পরের দিকে লোকায়ত ধর্মগুলি চৈতন্যদেব প্রবর্তিত উদার প্রেম ধর্মকে অবলম্বন করেই প্রসারিত হয়েছিল। এখানেই লোকধর্মের সঙ্গে চৈতন্যদেবের অনাবিল যোগসূত্র।

অর্থাৎ মধ্যযুগে অন্ত্যজ ব্রাত্য মানুষেরা গ্রামীণ পরিমণ্ডলে সমাজ ও অর্থনীতির বিপন্ন সময়ে উচ্চবর্গের ধর্ম ও উচ্চবর্ণের সমাজ পতিতের কাছে আশ্রয় পাননি -- এমনকি জোটেনি মানবিক স্বীকৃতি। সেদিন এই ব্রাত্য - অন্ত্যজ মানুষেরা নিজেদের বাঁচার তাগিদেই সৃষ্টি করেছিল নানা লৌকিক ধর্মের তথা উপধর্মের। এ প্রসঙ্গে গবেষক ড্ঃ সুধীর চক্রবর্তী তাঁর 'গভীর নির্জন পথে' গ্রন্থে দেখিয়েছেন —

> ''বাংলার লৌকিক উপধর্মগুলির ভিত্তিতে আছে তিনটি প্রবর্তনা — মুসলমান বাউল্ ফকির দরবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব, শোষিত শূদ্রবর্ণের ব্রাহ্মণ্য বিরোধ এবং লোকায়ত বৈষ্ণব ধর্মের উদার আহ্বান।।''

এবারে দেখি লোকায়ত বৈষ্ণব ধর্মের উদার আহ্বান কি ছিল?

বৈষ্ণব ধর্মের সারকথা গুলি হল ঃ

১. অস্পৃশ্যাতা বর্জন অর্থাৎ জাতি-বর্ণের কোন ভেদাভেদ নাই। সবাই সমান – "শ্রীকৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার"।।

২. হরিকে পেতে গেলে হরিনাম করতে হবে। অর্থাৎ ভগবানকে পেতে বৈষ্ণব সাধনায় যাগযজ্ঞ, ব্রাহ্মণ পুরোহিত, মন্ত্র, দেবতার মূর্তি -- এসবের প্রয়োজন নাই।।

৩. বৈষ্ণবকে হতে হবে সহিষ্ণু, আচরণে দীনাতিদীন। আর যে সব মানুষ মানহীন অবমানিত অবহেলিত -- তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে।।

৪. সেবা ও পরোপকার।।

৫. স্বাবলম্বিতা।।

৬. অহিংসা।।

আমরা লোকধর্মের যে সকল বৈশিষ্ট্য বা সাধনার মূলকথা দেখি — তার সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের অসাধারণ মিল রয়েছে। তবে যোগসূত্রকে আরো স্পষ্ট করতে আরো তিনটি ঘটনা বলতে হয় —

প্রথম ঘটনাটি হল – চৈতন্যদেব যখন ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে এই জেহাদ ঘোষণা করলেন তখন ব্রাহ্মণরা প্রচণ্ড অবমাননার সম্মুখীন হয়। যার প্রমাণ লালন ফকিরের শিষ্য দুদ্দু শাহের গানে পাওয়া যায় ঃ

> ''মহাপ্রভুর বিজয়ের কালে

যত দেশের বিটলে বামুন তারে পাগল আখ্যা দিলে।

মানুষ অবতার গোঁসাই

সাত্ত্বিক শরীরে উদয়

দেখে তাই পামর সবাই ভির্মিরোগ বলে।''

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রথমে পাগল, তারপরে ভির্মিরোগ বলেও শেষপর্যন্ত যখন মহাপ্রভুর বিজয় অভিযান ঠেকানো গেলনা তখন ব্রাহ্মণেরা এক আশ্চর্য কাণ্ড করলেন। কি সেই কাণ্ড?

''যখন দেখে মিথ্যা কিছু নয়

বৈষ্ণব এর গোত্র সৃষ্টি পায়

দেশের বামুন মিলে সবাই শাস্তর টীকা লিখে নিলে।''

অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা যখন দেখলো যে 'বৈষ্ণব' এক জাতিগোত্রতে পরিণত হয়েছে, আবার স্বীকৃতি ও সমর্থনও পাচ্ছে বৈশ্য-শূদ্র-বণিক সম্প্রদায়ের কাছে, তখন তারা নিজেদের আয়ত্বে আনার জন্য রচনায় মন দিল। বৈষ্ণবশাস্ত্র লিখে এরা পরিণত হল ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে।

অন্যদিকে, চৈতন্যদেবের শিষ্য নিত্যানন্দ ও তাঁর পুত্র বীরভদ্রের গূহ্য পরকীয়া মৈথুনাত্মক সাধন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের বিরোধ বাধে। পরে এই নিত্যানন্দ - বীরভদ্রের ধারায় তৈরি হল 'সহজিয়া মত'। যা লোকায়ত গানে এভাবে প্রকাশ পায় —

''নদের গোরা চৈতন্য যারে কয়

শাক্ত ভারতীর কাছে শক্তিমন্ত্র পায়।

গিয়ে রামানন্দের কাছে

বাউল ধর্মের তত্ত্ব পোছে

তবে তো মানুষ পরমতত্ত্ব পায়।।''

তারা নিজেদের দেহে রাধা-কৃষ্ণ সব বুঝতে চায়। এরা শাস্ত্রের চেয়ে বড় স্থান দেয় গুরুকে — যিনি দেহের সার্বিক অবস্থান ও ক্রিয়ার নির্দেশ দেন। এইখানে ঘটে যায় একটা বড় ভাঙন। কেননা, অনুমানের পথে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবরা তাদের শাস্ত্র আচার ও শুদ্ধ ভক্তি নিয়ে থেকে যায় বৈরাগ্যের পথে। অপরদিকে, বর্তমানের পথে সহজিয়ারা নেমে আসে জীবনের উষ্ণতায়, দেহের সাধনায় এবং গুরুর অনুশাসনে।

সুতরাং চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে তাঁব মৃত্যুব পব দুটি বিভাজন স্পষ্ট হয়, এক - নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব, দুই - সহজিয়া বৈষ্ণব।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল - মধ্যযুগে বাংলাব বিভিন্ন জেলায সূফি সাধকদেব আনাগোনা শুরু হয। তাদের সরল-সমর্পিত জীবন যাপন ও উদাব ধর্মেব পাশে কোবান ও নামাজ সংক্রান্ত মোল্লাতন্ত্রের বাড়াবাড়ি খুব কট্টর পর্যাযে পৌঁছে যায। সাধাবণ মুসলমান ও বহু শূদ্র তখন সূফিধর্মের উদার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পাবে না।

শ্রীচৈতন্যের উদার উন্মুক্ত বৈষ্ণবধর্মেব সংস্পর্শে এসে দলিত নিপীড়িত লোকধর্মেব মানুয বাঁচাব একটি দিশা যেন পেল। জাতি বর্ণেব সব বাধা-বিরোধ ঘুচিযে --- শুধু হৃদয়ের নির্দেশে ভক্ত মানুষ জনকে সংঘবদ্ধ কবার প্রথম সর্বব্যাপী প্রয়াস শ্রীচৈতন্যই করেন। তাই আজও গ্রামীণ অসহায় মানুষ চৈতন্যকে ত্রাতা হিসাবে মানে।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁর উদার বৈষ্ণব মত নিম্নবর্গেব মানুষের মনে যে উদ্দীপনা ও বাঁচার মন্ত্র রচনা করেছিল তার সঙ্গে সূফি মতের উদার মানবতাব মিশ্রণে বহু লোকাযত গৌণধর্ম গড়ে উঠেছিল। তাহলে এসব কি লোকধর্মেব সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের যোগসূত্র নয়!!

তৃতীয় ঘটনাটি হল -- দীর্ঘদিন ধবে ব্রাহ্মণ এবং তথাকথিত অভিজাতদের দ্বারা শোষিত হয়ে তথাকথিত অন্ত্যজশ্রেণী প্রতিবাদের পথ খুঁজছিল। কিন্তু তারা উপযুক্ত পথের সন্ধান তখনও পেয়ে উঠেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা পূর্ব জন্মেব কর্মফল এবং ভাগ্যের পবিহাস বলে সমস্ত যন্ত্রণা এবং শোষণকে নীরবে মেনে আসছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবেব আত্মপ্রকাশ এই শোষিত অন্ত্যজ মানুষগুলোকে প্রতিবাদেব পথ দেখায় -- এক্ষেত্রে চৈতন্যের ভূমিকাকে তিনটি স্তরে দেখানো যায় --

ক) চৈতন্যদেব নিজেই ছিলেন ব্রাহ্মণ।

খ) তিনি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত।

গ) জীবিত অবস্থায় অবতাররূপে স্বীকৃতিলাভ।

তাই তিনি যখন ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে সহজ সরল করেছিলেন, তখন তথাকথিত অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষ তাঁকেই তাদের পরিত্রাতা রূপে গ্রহণ করল মনে মনে, স্বাভাবিক ভাবেই তিনি হলেন মূলপ্রেরণা সঞ্চারক -- প্রতিবাদী ধর্মান্দোলনের।

এবারে আমরা আলোচনার শুরুর দিকে তাকিয়ে যোগসূত্র নির্ণয়ের দ্বিতীয় দিকের পথে এগোব।

উপধর্মগুলির কাছে কৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গ বলতে অন্য এক ধারণা দেখা যায়। সেই জন্য এরা আক্ষেপে বলে ওঠে —

'চৈতন্য মর্ম লোকে বুঝিতে নারিলা।'

এদের কাছে কৃষ্ণ হল ঃ--

"কোন কৃষ্ণ হয় জগৎপতি

মথুরার কৃষ্ণ নয় যে, যে কৃষ্ণ হয় প্রকৃতি।

জীব দেহে শুক্ররূপে

এ ব্রহ্মাণ্ড আছে ব্যেপে

কৃষ্ণ তারে কয়, পুরুষ যেই হয় সেই রাধার গতি।।"

এখানে এক অসাধারণ ভাবনার মৌলিকতা দেখা যায় এদের। কৃষ্ণ আসলে প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু অর্থাৎ শুক্ররূপী। আর তাকে ধারণ করে আছে যে পুরুষ দেহ সেই রাধা। তাহলে দেখা যাচ্ছে -- একই দেহে রাধা কৃষ্ণের মিলিত সত্তা আর সেই সত্তা গৌরাঙ্গ। এখানেই শেষ নয় —

পুরুষ আধারে শুক্র সন্নিবেশ মানেই সমন্বয় নয় – চাই কর্ষণ। কামাগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে ক্রিয়াকরণের মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ করতে হবে কৃষ্ণকে। তাই বলা হয়েছে —

"যে অগ্নিতে হলে দাহন

হয়ে যাবে অগ্নিবাহন

কর্ম হবে সিদ্ধকারক

কাঞ্চনবর্ণ হবে তার।"

অর্থাৎ কামাগ্নিতে দহনের শেষে কৃষ্ণ হবে কাঞ্চনবর্ণ। আর তাকেই বলা হয় গৌরাঙ্গ।

সেই জন্যই সাহেবধনী গৌণধর্মের গীতিকার কুবির গোঁসাই বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন —

"গৌর গৌর করছ যারে

সে গৌর তোমার সঙ্গে ফেরে।"

এই ধারণার সরল তাত্ত্বিক অর্থ হল —

"দয়াল গৌর হে তোমা বই কেউ নাই

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি যীশু তুমি কৃষ্ণ।"

মূল কথা হল — বিন্দু বা শুক্র ছাড়া কেউ নাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু যীশু কৃষ্ণ যে নামেই ডাকা হোক তাঁকে — আসলে সব কিছুর মূল 'শুক্রবীজ'।

সুতরাং লেকধর্মে 'চৈতন্য' মানে একটা বিশেষ 'চেতনা' বা 'Conception'।

নিজের দেহকে জানা। নিজের মধ্যে বস্তুরূপী কৃষ্ণকে জানা এবং তার সঙ্গে মেলা এই চেতনাই হলো গৌরতত্ত্ব। চেতনা কাব্যে নেই, শাস্ত্রে নেই। এ ধারণা গুরুশিষ্য পরম্পরায় লোকায়তিক। মৌখিক তবে প্রকাশ্যভাবে উচ্চারিত নয়। এই ধারণা শুধু উপপত্তিক নয় - - ক্রিয়াত্মকও। গুরুর উপদেশ অনুসারে শিষ্য তার আপনদেহে বক্ষে নেয় এই চৈতন্যসত্তার অবস্থান — চলাচল—ক্রিয়া।

সবশেষে, এই আলোচনার সূত্রে অনিবার্যভাবেই বলা যায় লোকধর্মেব প্রতি চৈতন্যদেবের প্রভাব অনাবিল। শুধু লোকধর্মই বা কেন লোকসংস্কৃতির অন্যান্য শাখাতেও এই প্রভাব বর্তমান। যার নিদর্শন রয়েছে লোকায়ত শিল্পকলার কারু-নকশাতে। রয়েছে ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, কিংবদন্তী, লোকসঙ্গীতপ্রভৃতিতে। শ্রীচৈতন্যের প্রেরণায় যে সহজভাব-সাধনা স্ফূরিত হয়েছিল — তারই ধারায় সঞ্জীবিত হয়েছে লোকধর্ম। যা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বয়ে চলেছে এই সূত্রে —

"Life is either a feast or a fast"

উৎস সূত্র ঃ—

১. চৈতন্য পরিক্রমা, সম্পাঃ ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, কলকাতা।

২. বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, (২য়, সং) সম্পাঃ ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, কলকাতা।

৩. 'গভীর নির্জন পথে' ড. সুধীর চক্রবর্তী, কলকাতা।

৪. 'পশ্চিমবঙ্গ' নদীয়া জেলা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৫. 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ' : ড. পল্লব সেনগুপ্ত, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালে ও যৌবনে দেখেছেন, কারখানার চিমনির ধোঁয়ায় কলকাতা শহর ও তার আশেপাশের আকাশ কালো হয়ে গেছে এবং নতুন বৈদ্যুতিক আলোয় সেকালের ভূতপ্রেত ও ব্রহ্মদৈত্যেরা পলায়ন করেছে। কিন্তু কলকাতা শহর বা তার উপকণ্ঠের গঙ্গাতীরবর্তী পাটকল অঞ্চলের বাইরে বাংলার ছায়াসুনিবিড় গ্রামাঞ্চলে ভূতের দৌরাত্ম্য তখনও একটুও কমেনি। ভূতপ্রেতের সঙ্গে মিলেমিশে অন্ধকারে পরম নিশ্চিন্তে একসঙ্গে মানুষও বসবাস করছে। তখনও গ্রামীণ জনসংস্কৃতির প্রবাহ ছিল জীবন্ত। এই স্বচ্ছন্দ গতিধারা এখানে সেখানে নানা কারণে শীর্ণ হলেও কোথাও স্রোত একেবারে শুকিয়ে যায় নি। জোড়াসাঁকোর ইঁট পাথরের পরিবেশের বাইরে, শিলাইদহে ও শান্তিনিকেতনে এবং বাংলার আরো অনেক গ্রামে এই জন সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ স্পর্শলাভের সুযোগ ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে। নিষ্প্রাণ শহুরে পরিবেশ থেকে তাঁর মন কাব্যের উৎস সন্ধানে বার বার ছুটে গেছে পল্লী মানুষের কাছে। এবং নিভৃতেই সেই শান্তি সাগরে অবগাহন করে তৃপ্ত হয়েছেন আর খুঁজে নিয়েছেন সৃষ্টির শক্তি।

বিচিত্রগামী রবীন্দ্রসাহিত্যের ধারায় কত দিক থেকে বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির কত প্রবাহ এসে যে মিলিত হয়েছে তার ঠিক নেই। সুবিস্তীর্ণ রবীন্দ্র সাহিত্য পরিক্রমা স্থিরভাবে চিন্তা করলে তা কতকটা উপলব্ধি করা যেতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ৭০-এর দশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু বিতর্ক তথা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞাননিষ্ঠ ও বিষয়গত শৃঙ্খলার রূপ নিতে শুরু করে। আর লোকসংস্কৃতির এই সু-শৃঙ্খল রূপ নিতে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছিলেন ম্যাক্সম্যুলার, বেন্‌ফে, ফিনিশ বিজ্ঞান ও সাহিত্য একাডেমীর সম্পাদক ক্রোহন কর্ল, ফ্রয়েড টেইলর-ল্যাঙ-গোম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। লোকসংস্কৃতি নিয়ে সারা ইউরোপে এই সক্রিয় আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন যে ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন সাহিত্য ধারায় ও লোকসংস্কৃতি চর্চায়।

রবীন্দ্রসংগীতে বাংলার লোকসংগীতের প্রভাব যে কত গভীর তা সংগীতজ্ঞের শিক্ষিত কান ছাড়াও সাধারণের কানেও ধরা পড়ে। ' যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', ' ও আমার দেশের মাটি', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস', 'আমার সোনার বাংলা', প্রভৃতি গানে বাউল সুরের প্রভাব প্রত্যক্ষ। তিনি নিজেই একথা স্বীকার করেছেন— "আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগ রাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেচে।"

বাংলার গ্রামাঞ্চলে বাউলের লোকপ্রীতির জন্য স্বদেশীযুগে ববীন্দ্রনাথ বাউল সুরের গানের ভিতর দিয়ে জনচিত্ত উদবুদ্ধ কবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। ' গোরা' উপন্যাসের গোড়াতেই তিনি ' কাজের শহর কঠিনহৃদয় ' কলকাতার রাস্তার ধারে আলখাল্লাপরা একটা বাউলকে এনে দাঁড় করিয়ে গান করিয়েছেন —

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।"

উপনায়ক বিনয়ের ইচ্ছা করতে লাগল বাউলটিকে ডেকে এনে এই অচিন্‌ পাখির গানটা লিখে নেয়, কিন্তু ভোর রাত্রে যেমন শীত শীত করে অথচ গায়ের কাপড়টা টেনে নিতে উদ্যম থাকে না। তেমনি একটা আলস্যের ভাবে বাউলকে ডাকা হল না, গান লেখাও হল না, কেবল ওই অচেনা পাখির সুরটা মনের মধ্যে গুন গুন করতে লাগল। 'গোরা' উপন্যাস রচনা রবীন্দ্রনাথ ১৩১৪সন থেকে আরম্ভ করেন। কিন্তু বাউলের অচেনা পাখির সুরটি তাঁর মনের মধ্যে আরও অনেক আগে থেকে গুঞ্জন করতে আরম্ভ করেছিল। তাই তো 'প্রায়শ্চিত্ত'তে ধনঞ্জয় বৈরাগীর এবং 'ফাল্গুনী'তে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আপন প্রাণের ছন্দে নেচে উঠেছেন কবি।

ভাবলে অবাক হতে হয়, প্রথাগত ভাবে লোকসংস্কৃতিবিদ না হয়েও রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতি চর্চা যে ভাবে করেছেন তার সঙ্গে আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ধারণা এবং কর্মধারার আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রানুসন্ধান, সংগ্রহ সংরক্ষণ, সংগ্রহকর্মে উৎসাহদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের সূত্রানুসারেই প্রধানত তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তায় দেশীয় সংস্কৃতির এই প্রেরণা ও প্রভাব কোথা থেকে এল এবং কেনই বা এল? কাব্যরসিকের কাছে এ প্রশ্ন হয়তো অবান্তর, কিন্তু লোকসংস্কৃতির চর্চা রবীন্দ্রনাথের নিকট ভদ্রলোকের অবসর বিনোদনের মত যদি না হয়ে থাকে এবং এই দেশীয় সংস্কৃতি যদি তাঁর সাহিত্যের প্রাণশক্তি জুগিয়ে থাকে তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার একটা তাগিদ থেকেই যায়।

দেশীয় জনকৃতির প্রতি অনুরাগের উৎস হল স্বজাতি প্রেম। কিন্তু দেশপ্রেম বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি তার সঙ্গে গভীরতা ও প্রসারের দিক থেকে এই স্বজাতি প্রেমের তফাৎ অনেক। উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকে আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষিত উদীয়মান মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনে স্বদেশানুরাগের সঞ্চার হতে থাকে, কিন্তু এই মধ্যবিত্তের শ্রেণী সীমানার বাইরে তার বিশেষ প্রসার হয় নি। তাঁদের দেশপ্রেম ঠিক ইংরাজী শিক্ষার মতোই বাইরের শোভাবর্ধন করত, মনটাকে স্পর্শ করত না। তাঁরা অনেকে হয়তো ইংরাজী আহার ও পরিচ্ছদকে বিজাতীয় বলে ঘৃণা করতেন, অথচ পাশ্চাত্য প্রভাবে সাহিত্যের

পরিবর্তন তাদেরকে ভাবাত না। এই ইংরাজী অভিমানী, মাতৃভাষাদ্বেষী বঙ্গবাসীর দেশপ্রেমের সংকীর্ণগণ্ডির বাইরে এসে বৃহত্তর জনসমাজের মনের অন্দরমহলে প্রবেশ করার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বজাতিপ্রীতির জন্ম, এবং এই জন জাতি প্রীতি থেকেই লোকসংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগের বীজ উৎসারিত হয়েছে। দৈবক্রমে এই অনুরাগের সঞ্চার হয় নি। এর একটা ইতিহাস আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' তে লিখেছেন —

" বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশ প্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে সময়টা স্বদেশ প্রেমর সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোক দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষা চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজীতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।"

বলাবাহুল্য, লোকসংস্কৃতিকে পেশাগতভাবে গ্রহণ করা বা এ নিয়ে গবেষণা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি লাভ করার তাগিদে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য তথা লোকসংস্কৃতি চর্চায় মনোনিবেশ করেননি। ফলে সকল বিষয়ে সমপরিমাণ আলোচনার দায়িত্ব তাঁর ছিল না। ছড়া এবং লোকসংগীত নিয়ে যতবেশী আলোচনা করেছেন, ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন, লোককথা বা গাথা নিয়ে ততটা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেননি। অথচ লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত প্রায় প্রতিটি বিষয়েই তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তার অসংখ্য প্রমাণ তাঁর আমৃত্যু সাহিত্য সাধনার প্রতিটি স্তরেই সুবিন্যস্ত হয়ে রয়েছে।

বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জমান ছড়াগুলির সংগ্রহ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন, " ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে,---- আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোটো বড়ো অনেক জিনিস অলক্ষিত ভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

'বঙ্গদর্শনে' প্রবন্ধটি রচনার ন'বছর পূর্বে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়েলি ব্রতের (১৩০৩) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সাধনা পত্রিকা সম্পাদনা কালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া ও মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।" আমরা সচরাচর অন্যাকে যে উপদেশ দান করি নিজেরা ব্যক্তিগত জীবনে তা অনুসরণ করি না। রবীন্দ্রনাথ শুধু ছাত্রদের ছড়া ইত্যাদি সংগ্রহের পরামর্শ দিয়েই কর্তব্য সমাপন করেননি, নিজেও সেই

দায়িত্ব পালন করেছেন সাধ্যমত। শুধু অঘোরনাথ বাবুর গ্রন্থের ভূমিকাই তার প্রমাণ নয়, প্রমাণ ১৩০১ সনের ১৬ই আশ্বিন তারিখে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় রবীন্দ্রনাথেব 'মেয়েলি ছড়া' নামে প্রবন্ধপাঠ, যেটি 'সাধনা' পত্রিকায় ১৩০১ সনের আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যায় ঐ একই নামে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রমাণের এখানেই শেষ নয়। রজনীকান্ত গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১ম বর্ষের ৩য় সংখ্যায় (১৩০১ বঙ্গাব্দ; মাঘ) প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' নামে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ছড়া এবং সেগুলির আলোচনা। উল্লেখযোগ্য লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের আবেদন কেবল ছাত্রদের উদ্দেশে ১৩১২ বঙ্গাব্দেই উচ্চারিত হয়নি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রেও তিনি আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন,— "এক্ষণে সাহিত্য পরিষদের পাঠকগণের নিকট সানুনয় অনুরোধ এই যে তাহারাও যথাসাধ্য আমাদের এই সংগ্রহ কার্যে সাহায্য করিবেন।" (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা; ১৩০১; মাঘ; পৃ ১৯২)।

ছড়া সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় প্রবন্ধ 'মেয়েলি ছড়া'ও প্রকাশিত হয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (৩য় সংখ্যা; ১৩০২)। ছড়া সম্পর্কে তাঁর শেষ প্রবন্ধ 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকার ১৩০৫ সনের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায়। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে এই প্রবন্ধগুলিই সংকলিত হয়। তবে পরিবর্তিত নামকরণ নিয়ে। যেমন 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত ছড়া সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধটির নামকরণ করা হয়, 'ছেলে ভুলানো ছড়া : ১'; সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত ছড়া সম্পর্কিত দুটি প্রবন্ধের নামকরণ করা হয় 'ছেলে ভুলানো ছড়া : ২' নামে। রবীন্দ্র সংকলিত ছড়ার সংখ্যা ৮১। তবে তিনি ছড়া সংক্রান্ত আলোচনায় এছাড়াও যেসব ছড়া ব্যবহার করেছেন সেগুলিকে ধরলে তাঁর সংকলিত ছড়ার সংখ্যা হবে শতাধিক।

লোক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান (Genre) সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সম্যকরূপে অবহিত, তথাপি ছড়ার প্রতি যে তাঁর বিশেষ অনুরাগ এবং অন্তরের অকৃত্রিম দুর্বলতা ছিল সে সত্য অনস্বীকার্য। বাল্যাবস্থা থেকেই কবি ছড়ার রাজ্য সম্পর্কে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

'জীবনস্মৃতি'তে কবি উল্লেখ করেছেন ঠাকুর বাড়ীর খাজাঞ্চী কিশোরী চাটুজ্জেও কবিকে ছড়ার জগতের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন তাঁর বাল্যকালেই ——

"দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া
থাক্‌ত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া।"

পরিণত বয়সে কবি যে ছড়া সম্পর্কিত আলোচনায় ব্রতী হয়ে বাল্যজীবনের এই সব সুমধুর স্মৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা তাঁর স্বীকারোক্তিতেই মেলে। কবির

'ছড়ার ছবি' 'ছড়া' কাব্যগ্রন্থগুলিতে এবং তাঁর অন্যান্য কাব্যে সংকলিত বহু কবিতায় তাঁর ছড়া প্রীতির নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ছড়া সম্পর্কিত আলোচনায় ছড়ার প্রতি তাঁর আকৃষ্ট হবার কারণগুলি উল্লেখ করেছেন। ছড়ার সঙ্গে কবির বাল্যস্মৃতির গভীর যোগ ছিল। এছাড়াও ছড়ার কাব্যরস, মাধুর্য, এর অসংলগ্নতা, চিরত্ব, অনায়াস রচনা কৌশল এবং চিত্রধর্মিতা কবি চিত্তকে মুগ্ধ করেছিল। সব মিলিয়ে ছড়ার কাব্যরসে কবি অভিসিক্ত হয়েছিলেন, "- - - তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে, সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।"

আপাত অসংলগ্ন অর্থহীন বলে প্রতিভাত ছড়াগুলির থেকে যে মূল্যবান নৃতাত্ত্বিক উপাদান লভ্য, সে বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের সচেতনতার পরিচয় মেলে একটি মন্তব্য থেকে— "যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্র তীরে কর্দম তটের উপর বিলুপ্ত বংশ সেকালের পাখীদের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল -- অবশেষে কালক্রমে কঠিন চাপে সেই কর্দম পদচিহ্ন রেখা সমেত পাথর হইয়া গিয়াছে -- সে চিহ্ন আপনি পড়িয়া ছিল এবং আপনি বহিয়া গেছে, ... তেমনি এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে।"

আমরা জানি লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ছড়ার পাঠান্তরই সর্বাধিক। নিছক ছন্দোনির্মিতি কৌশলকে আশ্রয় করে একই ছড়া যে নিত্য কত নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করে, রবীন্দ্রনাথ এই সত্য সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। তাঁর ভাষায়— 'ইহারা সজীব, ইহারা সচল, ইহারা দেশকালপাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে'। লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানী না হয়েও কিন্তু বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন কবি, বলেছিলেন "একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায়; তাহাদের মধ্যে কোনোটিই বর্জনীয় নহে। .... ছড়ার .... নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতিটি দেখাইতে গেলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ রক্ষা করা আবশ্যক"। শুধু মন্তব্য করেই ক্ষান্ত হননি কবি, তাঁর সংকলিত 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' ছড়াটির সর্ব মোট চারটি পাঠ প্রকাশ করেছেন।

ছড়ার ন্যায় লোকসংগীতের প্রতিও রবীন্দ্রনাথের গভীর আসক্তি ছিল। কারণ রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র বিলাসকলা কৌতূহল চরিতার্থতার জন্য এই লোক সমাজের অন্তরের সুরকে গ্রহণ করেন নি, এর ভিতর থেকেই তিনি খুঁজে নিয়েছেন তাঁর সাহিত্যের প্রাণশক্তি।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' বা 'প্রাচীন কবিসঙ্গীত সংগ্রহ' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বাংলার কবিয়ালদের গান সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। কবিগানের ক্ষণস্থায়িত্ব রসের জলীয়তা এবং নিকৃষ্ট কাব্যকলার কথা উল্লেখ করেও তিনি বলেছেন --

"তথাপি এই নষ্টপরমায়ু 'কবি'র দলের গান আমাদের সাহিত্য
এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ এবং ইংরাজ রাজ্যের অভ্যুদয়ে
সে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌর জনসভায়
আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই পথ প্রদর্শক।"

আবার বাউল গানের আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদকে তিনি জাতীয় সম্পদ বলে মনে করতেন। বাউল গানের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ হল, সমস্ত সামাজিক সংস্কার বিধিনিষেধ ও প্রথা-রীতি-নীতির বাইরে একান্ত সহজভাবে রূপের মধ্যে অরূপের, সীমার মধ্যে অসীমের জন্য ব্যাকুলতা। বাংলার বাউলের এই ভাবাকুলতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিচিত্তের প্রতিরূপ দেখতে পেয়েছিলেন। শিলাইদহ থেকে গ্রাম্য গায়কদের মুখে তাই তিনি বাউল গান শুনতে খুব ভালোবাসতেন এবং তার স্বতঃস্ফূর্ত উদাত্ত সুর ও গভীর ইঙ্গিতময়তা তাঁকে মুগ্ধ করত।

"কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।"

প্রভাতের রৌদ্রে পদ্মানদীর ধারে একলা একতারা হাতে বাউল সাধকদের চলার যে দৃশ্য রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, সেটা যেন তাঁর নিজেরই কবি জীবনের পথ চলার দৃশ্য। মানুষের জীবন পদ্মার তীরে বাউলের মতো একতারা হাতে, 'মনের মানুষ'কে সন্ধান করবার গভীর নির্জন পথে, তিনিও যেন গানের ধারা বেয়ে চলেছেন। বাংলার পল্লী কবির একতারাটিতে তাঁর কবি জীবনের মনের মানুষ খোঁজার ব্যাকুলতা এমন অপূর্ব সুরে যে ঝংকৃত হয়ে উঠবে তা তিনি নিজেও বোধ হয় ভাবতে পারেন নি। যখন বাউলের কণ্ঠে ও একতারায় তার ঝংকার শুনলেন তখন দেখলেন যে এ তাঁর নিজেরই হৃদয়বীণার ঝংকার। তার ভাষা সুর ও ছন্দের তো বটেই দার্শনিক তত্ত্বেরও গভীর আবেদন ছিল তাঁর কাছে। বাউল গানের আধ্যাত্মিক কথা নবীন বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার

করেছিল। তিনি লিখেছেন ——

'কোথায় পাব তারে

আমার মনের মানুষ যে রে।'

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্র দর্শন নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেছেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন, এই বাউল-দর্শনের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা কত ঘনিষ্ঠ। বাউলদের এই মনের মানুষ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন —

'The man of my Heart', to the Baul, is like a divine instrument Perfectly tuned. He gives expression to infinite truth in the music of life. And the longing for·the truth which is in us. Which we have not yet realised, breaks out in the following Baul Song :
Where shall I meet him, the Man of my Heart?
He is lost to me and I seek him wandering
from land to land.

....

(Creative Unity, London - 1922)

'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' নামে বিখ্যাত বাউলগানটির কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার উল্লেখ করেছেন। গানটি যে কতখানি তাঁর মনে দাগ কেটেছিল তাঁর বারংবার ব্যবহার ও উল্লেখ থেকে তা বোঝা যায়।

মানুষের সঙ্গে মানুষের ধর্মগত, জাতিগত ও বর্ণগত বৈষম্য যে মানুষেরই সংকীর্ণ জাগতিক স্বার্থে রচিত এবং এই বৈষম্যের অন্তরালে মানবাত্মার যে ঐক্য— এই সত্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পী জীবন ও মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সত্যরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। তার সঙ্গে আরও একটি বৃহত্তর সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি – সেটি হল, মানবাত্মার ভিতর দিয়েই পরমাত্মার স্বরূপ অনুভব করা সম্ভব। দেবতা মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায় নেই, কাশী, মক্কা, জেরুজালেমেও নেই। দেবতা আছেন মানুষের মধ্যে, জীবনের সাধনার

মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের এই জীবনদর্শন বাংলার লোকসংস্কৃতির মর্মস্থল থেকে গৃহীত বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর এই জীবন ধর্মই হল মানবধর্ম।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় দেশাত্মবোধক গান রচনায় এই লোকায়ত সুর ও ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে তিনি রচনা করেছিলেন "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে", "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" ইত্যাদি বিখ্যাত গানসমূহ। যেখানে রবীন্দ্রনাথ একেবারে খাঁটি দেশী সুর ব্যবহার করেছেন। সাধারণ মানুষের মনে স্বদেশ চেতনার যথার্থ উন্মেষ ঘটানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ সেদিন সঠিকভাবে দেশী সুরের কাঠামোকেই গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাউলের 'মনের মানুষে' ও জীবন দেবতাতে সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন।

পূর্বের কথা টেনে আবারও বলা যায় রবীন্দ্রনাথ এই লোকায়ত জীবনাচরণকে যেহেতু আপন মনের তাগিদে আপন করে নিয়েছেন, তাই লোকসংস্কৃতির সকল ধারায় তাঁর সমান উপস্থিতি সম্ভব হয়নি। তাই ছড়া ও লোকসংগীতের ক্ষেত্রে যেভাবে মেতে উঠেছিলেন সেভাবে লোক সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় সময় দিতে পারেন নি। তবে একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে লোকজীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাঁর সচেতন দৃষ্টি পড়েছিল তার প্রমাণ মেলে বাংলাদেশের সুপ্রচলিত একটি ধাঁধার ছড়ায়। যাকে অবলম্বন করে তিনি রঙ্গরসাত্মক কবিতা রচনা করেছিলেন —

"এতো বড়ো রঙ্গ যাদু এতো বড়ো রঙ্গ
চার মিঠে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।"

এছাড়াও গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত 'গুপ্তধন' গল্পের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত রয়েছে একটি ধাঁধা।

প্রবাদ প্রবচনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিয়েও রবীন্দ্রনাথ পৃথক কোন আলোচনা করেন নি, কিন্তু তাঁর গল্প উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধে প্রাচীন প্রবাদ ও প্রবচনের সুনিপুণ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। খনা এবং ডাকের বচন সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। বাংলা ভাষা পরিচয় গ্রন্থে লৌকিক ছন্দের আলোচনায় দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি খনা ও ডাকের বচন থেকে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় গীতিকার উল্লেখও দেখা যায়। বাংলার গীতিকা সাহিত্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্র সেনকে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথই উৎসাহিত করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব আগ্রহ থাকলেও বাস্তব অসুবিধার কথা উল্লেখ করে এক পত্রে তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে চন্দ্রকুমার দে'র

সহায়তায় দীনেশচন্দ্র সেন যখন ময়মনসিংহ গীতিকার সুবিপুল সংকলন বহু পরিশ্রমে ও অধ্যবসায়ে প্রকাশ করলেন তখন রবীন্দ্রনাথ এই প্রচেষ্টাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

লোক সাহিত্যের রসগ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সার্বিক ছিল বলেই তিনি বাংলা দেশের এই অবহেলিত অজ্ঞাত, নিরক্ষর সাহিত্য সম্পদ গীতিকার মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের সুরকে ধ্বনিত হতে শুনেছেন।

লোকসাহিত্য সংগ্রহ একটি বহির্মুখী বিষয়। সুযোগ সুবিধা এবং সামান্যমাত্র অনুরাগ থাকলেই এই কাজ সকলেই করতে পারেন। কিন্তু তাতে সংগহগুলি স্থায়িত্ব লাভ করার কোন উপায় বা সম্ভাবনা কিছুই থাকে না, শেষ পর্যন্ত তা উদ্দেশ্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ কেবলমাত্র যে বহির্মুখী ছিল না, তিনি তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনার সূত্রে যে এইসবকে গেঁথে নিয়েছেন, তাঁর সমগ্র জীবনের কার্য্যসাধনা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলেই তা বুঝতে পারা যাবে। আর এই সাধনায় লোককথা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করেছিল।

রাজপুত বীরত্ব গাথাগুলির সঙ্গে কবি বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর রচনায় এর জীবন্ত স্বাক্ষর 'কথা' কাব্যগ্রন্থ। এর অন্তর্গত 'বিবাহ', 'হোরিখেলা', 'নকলগড়'. 'গুরুগোবিন্দ', 'শেষশিক্ষা' প্রভৃতি কবিতাগুলি আলোচনা করলে বোঝা যায় শুধু রাজপুত নয় শিখগাথা ও কথার প্রভাবও রয়েছে।

'সোনারতরী' কাব্যে বাংলার রূপকথা অবলম্বন করে স্বতন্ত্র কাব্যরূপ কবি দিয়েছিলেন, যা তাঁর রূপকথা সম্পর্কিত পঠন-পাঠনের ইঙ্গিতবাহী। বিদেশী রূপকথার কিছু ছায়া-সম্পাতও এইসব কবিতায় ঘটেছে।

কবির সমগ্র সৃষ্টি এক ক্ষেত্র হতে উৎসারিত হওয়া সত্ত্বেও কাব্যে, নাট্যে, কথাসাহিত্যে, প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে বিভিন্ন প্রবাহ যেমন সহজে প্রবেশ করেছে তেমনি ঐ সকল ক্ষেত্রে বাংলার লোকসাহিত্যের রূপ, রস এবং ভাবনা সমান ভাবেই স্থান লাভ করেছে। সুতরাং বাংলার লোকসাহিত্য বিষয়ক ধ্যান তাঁর অলস বিলাসিতামাত্র ছিল না। তা সক্রিয়ভাবে তাঁর সমগ্র জীবনের কর্ম এবং সাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

লোকসংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতির অন্যান্য উপকরণের মতই লোকনৃত্যের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর শৈশবে লোকনৃত্যের প্রথম স্বাদ

পেয়েছিলেন খুব সম্ভবত ভিখারী বাউলের কাছ থেকে। এছাড়া, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরোয়া' গ্রন্থে স্মৃতিচারণার সূত্রে জানতে পারা যায়, আগে হিন্দু মেলায় রায়বেঁশে নাচ, বেদেনীদের বাঁশবাজির খেলা এবং বিচিত্র ধরনের লোকনৃত্যের আসর বসত। আবার বাংলা ও বাংলার বাইরে এবং বিদেশে ভ্রমণের সূত্রেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লোকনৃত্যের সুবিস্তৃত ধারার প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে। বাংলার ক্ষেত্রে যেমন যৌবনে শিলাইদহ-পতিসর, সাজাদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পরিভ্রমণের সূত্রে বিভিন্ন লৌকিক পালা-পার্বন, যাত্রাপালা, মেলার অনুষ্ঠান খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন কবি। গভীর রাত পর্যন্ত অটুট আগ্রহ নিয়ে বসে থেকে গ্রাম্য নৃত্য-গীত-অভিনয়ের রস তিনি পান করতেন। এর প্রমাণ মেলে তাঁর নিজস্ব রচনা ও শিলাইদহ অঞ্চলের অধিবাসীদের রচনায়। বাংলার বাইরে ভ্রমণের সূত্রে ত্রিপুরাতে 'রাসনৃত্য', 'দোলযাত্রা নৃত্য' মণিপুরী নৃত্য প্রভৃতি, আসাম ও সিলেটে — সেখানকার আদিবাসী ও মণিপুরী নৃত্য রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেন এবং গভীর ভাবে অভিভূত হন। অনুমান করা যেতে পারে ভারতের পূর্বাঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক ভ্রমণের সূত্রে বিচিত্র ধরনের আদিবাসী বা উপজাতি নৃত্য এবং লোকনৃত্য প্রত্যক্ষ করার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাই-ই বিসর্জন নাটকে রূপবদ্ধ হয়েছে।

শান্তিনিকেতনের পাশের গ্রামগুলি সাঁওতাল অধ্যুষিত। বিখ্যাত সাঁওতালি নাচ কবি একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এমনকি শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলার অনুষ্ঠানে সাঁওতাল নারী পুরুষের সমবেত নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। এছাড়া সাঁওতাল পল্লীতে বাঁধনাপরবের অনুষ্ঠানে কবি সাঁওতালি নাচ গানের রসোপভোগ করতেন। আর এই রস বোধের দৃষ্টিতে বীরভূম তথা বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকনৃত্যের পুনরুদ্ধার কর্মে ব্রতী ও লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল গুরুসদয় দত্তের প্রচেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং এর সাফল্য কামনা করেছিলেন।

লোকনৃত্যের প্রতি এই আন্তরিকতার ফলে তাঁর বিভিন্ন নাটকে নৃত্য ভঙ্গিমায় লোকনৃত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। 'ফাল্গুনী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অন্ধ বাউলের ভূমিকার আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে বাউল সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন। 'শারদোৎসব' থেকে শুরু করে তাঁর রূপক সাংকেতিক নাটকগুলিতে বালকের দল, ঠাকুরদা, ধনঞ্জয় বৈরাগী, বাউল প্রভৃতি চরিত্রগুলির নৃত্য পরিকল্পনায় লোকায়ত নৃত্যের বাতাবরণটি সুস্পষ্ট।

এছাড়া লৌকিক নাট্যকলার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। যেমন - গীতি প্রাধান্য লৌকিক অভিনয় কলার একটি অন্যতম

বৈশিষ্ট্য। প্রথম যুগে তাঁর গীতি নাটকগুলির মধ্যে সংগীতের প্রাধান্য এরই প্রভাব। 'বাল্মীকি প্রতিভা' যার অন্যতম নিদর্শন।

আবার বাংলার লোকশিল্প সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন; এই বিষয়ক অবনীন্দ্রনাথের সব কাজে তিনি সহায়ক ছিলেন, এ কথা সকলেই জানেন। এমনকি, লোকশিল্পের নানা উপকরণ সংগ্রহের কাজেও তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯১৫-১৬ সালের শীতকালে একবার কবি মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন পদ্মার চরে বোটে বাস করছিলেন। সাক্ষাৎকালে মোহিতলাল দেখেন যে তাঁর ঘরের একপাশে কয়েকখানা বেঞ্চির উপর বিচিত্র সব দ্রব্য সম্ভার সাজানো। সেগুলির দিকে কৌতূহলীর মতো তাকাতেই কবি তাঁকে বলেন —

"আমি কিছুদিন যাবৎ একটা বিষয়ে বড় উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি; বাংলার নিজস্ব আর্ট-আইডিয়া ক্রমেই বিদেশীয় প্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, আর কিছুদিন পরে আমাদের খাঁটি দেশীয় শিল্পের নিদর্শনগুলি লোপ পাইবে। তাই আমি এই সকল নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

মোহিত লাল লিখেছেন ——

"চাহিয়া দেখিলাম এক জায়গায় কয়েকটি মাটির ঘরের মডেল, তাহাদের খড়ের চালের বিবিধ স্টাইল লক্ষণীয়; বুঝিলাম কবি, ওই ঘর-দাওয়ার মধ্যেই যে শিল্প চাতুর্য্য আছে, তাহাই বাঙালীর নিজস্ব বলিয়া গৌরব বোধ করেন। পাশেই কতকগুলি কাঁথা রহিয়াছে, তাহাদের সেই সূচী-কর্ম্ম সত্যই মহার্ঘ্য বলিয়া মনে হয়। স্মরণ হইতেছে, কতকগুলি 'শিকা'ও বোধহয় ছিল, রজ্জু-শিল্পের নিদর্শন বলিয়া তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল — মোটা ব্রাউন পেপারের একটি তবক, সেগুলিতে আলপনার নানা নক্সা অতি সরল স্থূল রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। এগুলির প্রতি কবির মমতা যেন কিছু অধিক; ইহাই বাংলার প্রকৃতিরূপা গৃহলক্ষ্মীদের স্বহস্তরচিত কারুসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাহাদের পরিকল্পনায় — ফুল, লতা, পাতা, পাখী ও নানা নিত্য পরিচিত রূপাবলীর যে সুষমা বিন্যাস, তাহাই সত্যকার শিল্পী মনের পরিচায়ক। সবচেয়ে মুগ্ধকর তাহাদের সেই অতি সরল ও সাবলীল রেখাঙ্কন — যেন শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ একেবারে মন হইতে অঙ্গুলি প্রান্তে পৌঁছিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আলিপনা শিল্পকে ধরিয়া রাখিবার এই কৌশলচিত্ত অভিনব বলিয়া মনে হইল — কবির প্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহ যেন তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে।"

(রবি প্রদক্ষিণ (১৩৫৬) 'পদ্মাবক্ষে রবীন্দ্রনাথ'
অধ্যায় পৃ ১৭৪)

পদ্মার চরে নির্জন কক্ষে মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে লোকসংস্কৃতির যে নিদর্শনগুলি দেখেছিলেন তা ফোক্-মিউজিয়মে দেখা দেতে পারে। ১৯১৫-১৬ সালে কোনো সংস্কৃতি বিজ্ঞানীর কল্পনায় এইরূপ ছিল কিনা সন্দেহ। নমুনাগুলির তালিকা দেখে আজকের দিনে যেকোন সংস্কৃতি বিজ্ঞানী অবাক তো হবেনই হয়ত কতকটা আফ্‌শোসও করবেন। বাংলার নানা প্রকারের খড়ের চালা ঘরের নমুনা -- একচালা, দোচালা, চৌচালা, আটচালা — Pitched ও Curvilinear চালা -- চালার গড়ন, বাঁধন, প্রসার ইত্যাদি যে Material Culture অনুশীলনের অপরিহার্য বিষয়বস্তু তা নৃবিজ্ঞানী মাত্রই জানেন। কাঁথা, দড়ির শিকা ইত্যাদিও উপেক্ষনীয় নয়। লোকশিল্পের নিদর্শন রূপে তো বটেই, যে কোনো দেশের লোকায়ত সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের জন্য কিভাবে প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের সঙ্গে জনমনের শিল্পরসবোধের মিলন ঘটেছে তার বিচার বিশ্লেষণের জন্যও এগুলির প্রয়োজন আছে। বাংলার মেয়েদের আলপনা চিত্রগুলিও যে কত যত্ন করে রবীন্দ্রনাথ তখন সংগ্রহ করতেন তাও মোহিতলালের বিবরণ থেকে বোঝা যায়। ব্রতকথা ও ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভব আলপনাগুলিও তিনি সংগ্রহ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন ব্রতের ছড়ার সঙ্গে ব্রতীর জীবনের যে যোগ ব্রতের আলপনার সঙ্গেও ব্রতীর জীবনের ঠিক সেই যোগ আছে। অনেক আলপনায় বিলেতি নকশার ছাপ পড়েছে দেখা যায়। গ্রাম্য মেয়েদের মনে হয়তো এ রকম ধারণা হয়েছে যে দেশী আলপনার সঙ্গে বিলেতী নকশার বৈচিত্র্য কিছু মিশিয়ে দিলে আলপনার মর্যাদা বাড়বে এবং তা ভদ্রজনের প্রশংসা লাভ করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বাংলার আলপনা চিত্রগুলি অদম্য আগ্রহ নিয়ে সংগ্রহ করেছিলেন এবং মনে হয় তাঁর এই আগ্রহ (এবং সংগ্রহ) ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে 'বাংলার ব্রত' রচনায় তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতির উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও বাংলাদেশের মেলা ও উৎসবের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। প্রধানত লৌকিক ধর্মের প্রয়োজনেই গ্রামের মেলাগুলির উদ্ভব হয়েছে; তারপর ক্রমে এদের সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক অন্যান্য বিষয়ও যুক্ত হয়ে জাতীয় জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। কিন্তু ক্রমে বহু জন সমাবেশের ফলে ধর্ম অত্যন্ত গৌণ হয়ে ব্যবসা প্রাধান্য লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থার কথা অনুভব করে বলেছিলেন যে, গ্রামজীবনকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা না করে এই মেলাগুলি উদ্ধারের কল্পনা অর্থহীন, কারণ এইসব মেলাই গ্রাম্য সমাজ জীবনেরই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি।

তাই উপসংহারে বলা যায়, বাংলার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে প্রগাঢ়

অনুরাগ ছিল সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। তাই তো রবীন্দ্রনাথ দেশের ছাত্রদের সম্ভাষণ করে একদিন বলেছিলেন, – "দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষি কুঠিরে, প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা জানিবার জন্য শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।"

উৎসসূত্র ঃ ১. বাংলা লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব ঃ বিনয় ঘোষ, কলকাতা (১৩৮৬ সন)।

২. লোকসংস্কৃতি ঃ নানা প্রসঙ্গ (২য় সং) ঃ ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী, কলকাতা।

৩. রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি ঃ সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা

৪. রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

৫. বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস (৩য় সং) ঃ ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ সমূহ

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ সমূহ ঃ

আলম, সৈয়দ মাহবুব, " লোকশিল্পের জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন : প্রসঙ্গ নকশী কাঁথা", বাংলাদেশের লোকশিল্প (সম্পা : সৈয়দ মাহমুদুল হাসান) বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৩।

আহমদ, তোয়াফেল, আমাদের প্রাচীন শিল্প, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯২।

আহমদ, তোয়াফেল, লোকশিল্পের ভুবনে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

আহমদ, তোয়াফেল, লোকশিল্প, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

ইসলাম, মযহারুল, "বাংলাদেশের আধুনিক সমাজ ও ফোকলোর" প্রবন্ধ সংগ্রহ, (সম্পা : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও সৈয়দ আকরম হোসেন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭৮।

ইসলাম, মযহারুল, ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৩

খান, শামসুজ্জামান, মাটি থেকে মহীরূহ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৪।

গুঁই, মৃত্যুঞ্জয়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে লোকাচার ও লোকবিশ্বাস (চর্যাপদ থেকে ভারতচন্দ্র), প্রত্যয়, কলকাতা, ১৯৯২।

গুহ, করুণাদাস, "কুটীরশিল্প ও বঙ্গীয় শিল্প বিভাগ", প্রবাসী, কলিকাতা ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ১৯৩৪

গুপ্ত, বিজয়, পদ্মাপুরাণ (সম্পা: যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৬।

ঘোষ, স্বপন কুমার, বাংলার কুটীরশিল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৬।

ঘোষ, বিনয়, লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৬।

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, লোক বিশ্বাস ও লোক সংস্কার, ৩য় সং, পুস্তক বিপণি , কলকাতা, ১৯৯৫।

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ১৯৯৫।

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার, বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস, ৩য় সং, পুস্তক বিপণি ১৯৯৮।

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার ও মজুমদার, দিব্যজ্যোতি (সম্পা:), বাংলার লোকসংস্কৃতি, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ১৯৯৬।

চট্টোপাধ্যায়, দেবদাস, রাঢ়বঙ্গের উৎসর্গশিল্প, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ১৯৯৪।

চক্রবর্তী, বিমলেন্দু, লোকায়ত বাংলার চিত্রশিল্পী ও চিত্রকলা, স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪০৩।

জানা, অচিন্ত্য, বাঁকুড়ার অর্থনীতিতে লোকশিল্প, ১ম খণ্ড, রাঢ় আকাদেমি, বাঁকুড়া, ১৯৯৪।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বলাকা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, সংস্করণ ১৯৭০,

তর্করত্ন, শ্রী পঞ্চানন (সম্পা:), বহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯১।

তালুকদার, খগেশকিরণ, বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭।

দে, বিষ্ণু, " লোকশিল্পের ভবিষ্যৎ", প্রবন্ধ সংগ্রহ, (সম্পা: মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও সৈয়দ আকরম হোসেন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৭৮।

নস্কর, সনৎ কুমার, মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্য, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৫।

পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকতা,১৯৭৬।

বসু, বুদ্ধদেব, গোলাপ কেন কালো, আনন্দ পাবিলশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৮।

বসু, বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৫।

বিনোদ, শ্রীরায়, পদ্মাপুরাণ, (সম্পা: মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৩।

বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৭২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার, বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৯।

ভট্টাচার্য, সব্যসাচী, ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি,আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা,১৩৯৬।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট

লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৯।
ভট্টাচার্য, রামেশ্বর, শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন (সম্পা: যোগীলাল হালদার), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৭।
মজুমদার, রবীন্দ্র, বাংলার লোকশিল্প, কলিকাতা, ১৩৬৩।
মণ্ডল, সত্যানন্দ, দক্ষিণ - চব্বিশ পরগণার লোকশিল্প, অস্তিত্ব, কাশীনগর, ১৯৮৪।
মামুন, মুনতাসীর, ঢাকা : স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।
রায়, অরুণ কুমার, লোকায়ন চর্চার ভূমিকা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৯৫।
রায়, যতীন্দ্রমোহন, ঢাকার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, যামিনী মোহন রায়, কলকাতা, ১৯১১।
শাহেদ, সৈয়দ মহম্মদ, ছড়ার বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, ১৯৮৮।
সরকার, আর., এম., নৃবিজ্ঞান পরিচয়, ২য় খণ্ড, এম. রায়, কলিকাতা, ১৯৯৩।
সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ, শিল্পরূপময় বাঁকুড়া, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯১।
সিংহ, মাণিকলাল, রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি, বিষ্ণুপুর, ১৯৮২।
সিদ্দিকী, আশরাফ, লোকসাহিত্য, মুক্তধারা, ঢাকা, ১ম খন্ড - শেষ সংস্করণ ১৯৯৪ (প্রথম প্রকাশ - ১৯৬৩), ২য় খণ্ড - ২য় সংস্করণ - ১৯৮০ (১ম প্রকাশ - ১৯৬৩)
সেন, সুকুমার, বিচিত্র সাহিত্য, ২য় খণ্ড, ইস্ট এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, তারিখবিহীন।
সেনগুপ্ত, পল্লব, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৫।
সুর, অতুল, বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৬।
সুর, অতুল, ভারতের নৃতাত্ত্বিক - পরিচয়, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৮।
সুর, অতুল, মানব সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৯২।

সহায়ক ইংরাজী গ্রন্থ সমূহ :-

Banerjee, Hemendra Nath, Introducing Social And Cultural Anthropology, K.K. Publication, Calcutta, 1990
Brunvand, Jon, Harold. The study of American Folklore : An Introduction, W.W. Norton and company, New york, 1978

Chakrabarty, Siten & Radha Krishna Bari, Handicraft of West Bengal, Publication Department. Institute of Art and Handicraft, Calcutta, 1991.

Dundes, Alan, Interpreting Folklore, Indiana University Press, Bloomington, 1980.

Dorson, Richard. M.,American Folklore, The University of Chicago Press, Chicago, 1951.

Glassie, Henry, The Spirit of Folk Art, Museum of International Folk Art, New York, 1989

Georges, Robert, A., and Jones, Michael owen, Folkloristics An Introduction, Indiana University Press, Bloomington and Indiana Polis, 1995

Haque, Zulekha, Gahana : Jewllery of Bangladesh, Bangladesh small and cottage Industries Corporation, Dhaka, 1984.

Haselbargar, Herta, Method of studying Ethnological Art, Chapman & Hall, London, 1961.

Hunter, W.W., Statistical Account of Bengal, Trubner & Company, London, 1875.

Khan, Shamsuzzaman, Folklore of Bangladesh, (Vol-2), Bangla Academy, Dhaka, 1992.

Levi-Strauss, Claude, The Way of the Masks, University of Washington Press, Scattle, 1982

Mahmud, Firoz, Prospects of Material Folk Culture Studies And Folklife Museums In Bangladesh, Bangla Academy, Dhaka, 1993.

Roy Sudhanshu Kumar, The Folk-Art of India, Yogalayam, Calcutta, 1976.

Tavernier, Travels in India, (Translated by V. Ball), EIC, London, 1899.

Taylor, James, Sketch of the Topography and Statistics of Dacca, The East-India Company, Calcutta, 1940.

Walt, George, The Commercial Products of India : Indian Exibition in Delhi, Chapman & Hall, London, 1903.

Wise, James, Notes on the Races, Castes and trade of Eastern Bengal, EIC, 1883.

সহায়ক বাংলা পত্র-পত্রিকা সমূহ ঃ

ইসলাম, মযহারুল (সম্পা:), 'ফোকলোর', বাংলাদেশ ফোকলোর সোসাইটি, ঢাকা, জুন, ১৯৯৮।

খান, শামসুজ্জামান, "ইতিহাস রচনা ও ফোকলোরবিদ", সংবাদ, ঢাকা, ২৭.১.১৯৯৪।

খান, শামসুজ্জামান, " ফোকলোর চর্চার সাম্প্রতিক প্রবণতা"; সংবাদ ঢাকা, ১৫.৭.১৯৯৩।

গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার; "পশ্চিমবাংলার লোকশিল্প"; আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবার, ৩রা মার্চ, ১৯৫৭।

ঠাকুর, শান্তনু; "মুর্শিদাবাদের শঙ্খ-শিল্প"; গণকণ্ঠ, মুর্শিদাবাদ, লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, ১৯৮৫।

দাস, শৈলেন ও মণ্ডল, নমিতা (সম্পা:); বাঁকুড়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ১ম খন্ড; বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি আকাদেমি; বাঁকুড়া, ১৯৯৭।

ফোরেশী, মাহমুদ শাহ্, "মার্কিন ফোকলোর"; দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১১.১১.১৯৯৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, "দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প", প্রবাসী, কলিকাতা, ২য় খন্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯২৯।

বসু, আশীষ; "বাংলার কারুশিল্প"; মাসিক বসুমতী, কলিকাতা, ২য় খন্ড, ৩য় সংখ্যা, ১৩৭০।

মাহমুদ ফিরোজ, "ইতিহাস চর্চায় ফোকলোরের গুরুত্ব"; সংবাদ, ঢাকা, ৬.১.১৯৯৪।

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি (সম্পা:); "পশ্চিমবঙ্গ ঃ তেভাগা সংখ্যা"; তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা, মে, ১৯৯৭।

মোডে, হাইনৎস (ভাষান্তর : চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত); "লোক সংস্কৃতির স্বরূপ ও বাংলার লোকশিল্প"; লোকশ্রুতি, কলিকাতা, দ্বাদশ সংখ্যা, ১৯৯৬।

'লোকশ্রুতি', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ; পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা, অষ্টম সংখ্যা, মার্চ, ১৯৯১।

'লোকশ্রুতি', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ; পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা, সপ্তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯০।

সরকার, শিপ্রা, শঙ্খশিল্প, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।

সেনগুপ্ত, গৌতম; "প্রাচীন বাংলার লোকায়ত শিল্পধারা"; লোকশ্রুতি, কলিকাতা,

একাদশ সংখ্যা, ১৯৯৪।
সেন, গোপীনাথ; "পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প"; পশ্চিমবঙ্গ, কলিকাতা, ২৮শ সংখ্যা, ১৯৮৫।

সহায়ক ইংরাজী পত্র-পত্রিকা সমূহ ঃ

Deb, Chittaranjan, "Influence of Folk-Art on some Modern Artists," Folklore, V-1, No. 5, Calcutta, 1960.
Hornell, James; "The Chank-Bangla Industry : Its Antiquity and present condition"; Memories of Asiatic Society Journal (vol. 3); Calcutta, 1912; P. 408, 410,411,423,425, 407,426, 443, 432, 409.
Khan, Shamsuzzaman; "Bangla Folklore"; Bangla Academy Journal; Bangla Academy, Dhaka, January 1988 -- June 1991.
Orta, Gercia Da; "The Trade In Bengal"; The Journal of the Asiatic Society of bengal, Calcutta, 1910.
Srinivas, N.; "The Folk-Art of Orissa"; Folklore, V-1, No-3, Calcutta, 1960.